৩৯

১৯৯৩

সরস কার্টুন

হাসতে হাসতে ভুলে যাবেন না, পাঁচ টাকা দিন

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

স্বাধীনতার সুরক্ষা মূলক বর্ম

**জাতি, ধর্ম,
গোষ্ঠী নির্বিশেষে ভারতের
জনগন আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এক
হয়ে সংগ্রাম করেছে।**

এই সংগ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আমাদের ঐক্য
ও আত্মত্যাগের ভাবনা এবং আমাদের
ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গী।

সেই ভাবনাই কেবলমাত্র আমাদের ঐক্যবদ্ধ
রাখতে পারে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে
পারে।

davp 92 202 Ben

ধর্ম নিরপেক্ষতা–আমাদের স্বাধীনতার সুরক্ষা কবচ

বারো থেকে বিরানব্বুই সকলের জন্যে
হাসির একমাত্র মাসিক পত্রিকা

সরস কার্টুন

৩৯
চতুর্থ বর্ষ: তৃতীয় সংখ্যা
মার্চ ১৯৯৩

এই অসাধারণ পত্রিকার কোনও বিকল্প নেই।
কেন্দ্র, রাজ্য ও সংসারের বাজেটের যাঁতাকলের মাঝে আপনার একমাত্র রিলিফ

ঘোষণা

পাঠকদের এবার একটা দারুণ খুশীর খবর দিচ্ছি। 'সরস কার্টুন'এর চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আমরা জানুয়ারী '৯৩ থেকে দাম বাড়াবার বদলে দাম কমাচ্ছি। জানুয়ারী '৯৩ সংখ্যা বা তার পরে থেকে যাঁরা বার্ষিক গ্রাহক হবেন তাঁরা পূজা সংখ্যা সমেত বছরের সমস্ত সংখ্যা ৮৫ টাকার পরিবর্তে মাত্র ৭০ টাকায় পাবেন, ডাক খরচ আমরাই বহন করব। পূজা সংখ্যা বাদে যাঁরা গ্রাহক হবেন তাঁরা ৫০ টাকার পরিবর্তে মাত্র ৪৫ টাকায় এক বছরের দশটি সাধারণ সংখ্যা পাবেন। ডাক খরচ আমাদের।

নতুন বছরে "সরস কার্টুন"কে এগিয়ে নিয়ে যেতে এখনই আপনার বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার করে পাঠান। টাকা পেলেই প্রথম সংখ্যাটির সাথে আপনার গ্রাহক-কার্ড পাঠানো হবে। ঘরে বসে প্রতি মাসে পত্রিকা পেতে হলে গ্রাহক হওয়াই ভাল।

— সম্পাদক "সরস কার্টুন"

সরস কার্টুন
সম্পাদক সুকুমার রায় চৌধুরী
কার্যালয় ঃ ৬৯-জি, সেলিমপুর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৩১ ফোন ঃ ৪২-৫৭৪৪

BAISHALI MULTILAYERS (P) LTD.

Regd. Office 1-B, Broad Street, Calcutta—700 019

Factory P.O. & P.S. KOTULPUR Distt. BANKURA WEST BENGAL

MANUFACTURER OF

C.O. EXTRUDED MULTILAYER FILM
FOR
PACKAGING INDUSTRY

সূচীপত্র

হাসির গল্প

একটুকু বাসা মনোজ বসু ৮

ঘাতকের ভূমিকায় অম্লান তলাপাত্র ২২

বিয়ে ঘটিত ঘটনা মনীশ মাইতি ২৮

ফিচার

আড়চোখে লক্ষ্মীট্যারা ৪

পত্রাঘাত শ্রী রসময় সর্বজ্ঞ ২০

ছড়া

নরকেই যেতে চাই সুবীর গুপ্ত ২৬

শিল্প ধর্মঘট বিনম্র বিশ্বাস ২৬

মহাভারতের কথা

অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় ২৭

লঘুপাক

হাসিটুন সঞ্জীব সিংহ ১৯

জোকস (অচলপত্র থেকে) ১৯

কার্টুন এঁকেছেন

পার্থ মিত্র (ডাকু), সুকুমার রায় চৌধুরী

কাজী, পরিচয় গুপ্ত (পিজি),

রজতকান্তি সরকার ও শুভজিৎ সিন্‌হা।

অলংকরণ ও প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

সুকুমার রায় চৌধুরী

প্রচ্ছদ কার্টুন রেবতীভূষণ ঘোষ

(অসম মাধ্যমিক শিক্ষক ও কর্মচারী সংস্থা রাজ্য সম্মেলন স্মারক গ্রন্থ ১৯৯১ থেকে সুহাস করের সৌজন্যে)

জেনে রাখুন

- যে মাসের সংখ্যা তা আগের মাসের শেষেই বেরিয়ে যায়।

- প্রতি সংখ্যা পাঁচ টাকা। বার্ষিক সডাক গ্রাহক মূল্য ঃ পূজা সংখ্যা সহ পঁচাশি টাকা (১১টি সংখ্যা, কারণ পূজা সংখ্যাটি অক্টোবর-নভেম্বর যুগ্ম বিশাল সংখ্যা)। পূজা সংখ্যা বাদে (১০টি সাধারণ সংখ্যা)—৫০ টাকা। এক বছরের কমে গ্রাহক করা হয় না।

তবে আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে পত্রিকার চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আমরা বার্ষিক গ্রাহকদের জানুয়ারী '৯৩ থেকে ১৫ টাকা কমে মাত্র ৭০ টাকায় পূজা সংখ্যা সহ গ্রাহক করছি। সাধারণ গ্রাহকরা পাবেন ৫ টাকা ছাড়। অর্থাৎ ৫০ টাকার পরিবর্তে ৪৫ টাকা (১০টি সাধারণ সংখ্যা)।

ঘরে বসে প্রতিমাসে বুক পোস্টে পত্রিকা পেতে হলে পুরো নাম, পিন কোড সহ ঠিকানা এবং কোন্ সংখ্যা থেকে পত্রিকা চান তা কুপনে লিখে আজই ৭০ টাকা অথবা ৪৫ টাকা মানি অর্ডারে আমাদের কার্যালয়ে পাঠান। টাকা পেলেই আপনাকে গ্রাহক করে নেওয়া হবে ও প্রথম সংখ্যাটির সাথে আপনার গ্রাহক কার্ড পাঠানো হবে।

ডাক বিভাগের গাফিলতিতে কোনও সংখ্যা না পেলে উর্দ্ধতন এবং স্থানীয় ডাক কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করবেন। ডাক বিভাগের দোষের জন্য আমাদের পক্ষে অগণিত গ্রাহকদের বার বার পত্রিকা পাঠানো সম্ভব নয়।

- হাসির লেখা পরিষ্কার করে কাগজের একদিকে লিখে পাঠাতে পারেন। লেখা ছোট হওয়া বাঞ্ছনীয়। মনোনীত হলে যে কোনও সংখ্যায় বিনা পারিশ্রমিকে ছাপা হবে এবং সৌজন্য সংখ্যা পাঠানো হবে। সঙ্গে পোস্টকার্ড, ডাকটিকিট বা খাম দেবেন না, কারণ লেখা মনোনীত হলো কিনা বা হলে কোন্ সংখ্যায় ছাপা হবে তা ব্যক্তিগতভাবে জানানো সম্ভব নয়। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেওয়া হয় না। কাজেই লেখার কপি রেখে পাঠাবেন।
- কার্টুন ভাল কাগজে চাইনিজ ইঙ্কে এঁকে পাঠাতে পারেন। মাপ চওড়ায় ৩ বা ৬ ইঞ্চি, উচ্চতা আনুপাতিক। পেন্সিল, লেখার কালি, বলপেন বা স্কেচপেনে আঁকা কার্টুন ভাল হলেও ছাপা যাবে না। কার্টুন ভাল হলে যে কোনও সংখ্যায় ছাপা হবে বিনা পারিশ্রমিকে এবং সৌজন্য সংখ্যা পাঠানো হবে। অমনোনীত কার্টুন ফেরত দেওয়া যাবে না বা ব্যক্তিগতভাবে মতামত জানানোও সম্ভব নয়।
- স্থানীয় বিক্রেতারা আমাদের ডিস্ট্রিবিউটার পাতিরাম বুক স্টল, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা থেকে পত্রিকা নিতে পারেন। বাইরের এজেন্টরা সরাসরি আমাদের কার্যালয়ে এজেন্সির জন্য লিখুন।

৬৯-জি, সেলিমপুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩১ ফোন ৪২ ৫৭৪৪

আড়চোখে

লক্ষ্মীট্যারা

বিদ্যুতের দাম ফের বাড়ছে পর্ষদ এলাকায়—সংবাদ।

● সাপ্লাই কম হলে দাম তো বাড়বেই। ব্যালেন্স ঠিক রাখতে হবে না?

রাস্তা তৈরী নিয়ে কংগ্রেস ও সি পি এম এই দুই পঞ্চায়েতের মধ্যে বিরোধের ফলে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।—সংবাদ।

● হবেই তো! রাস্তা তৈরী হয়ে গেলে একই পথ দিয়ে চলবার সময় দুই দলে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে কি ভাল হতো?

বৈধ কাগজপত্র না দেখাতে পারায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের ৫১ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে সাপুড়ে শেখ ইয়াসিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি জীবন্ত বড় ময়াল সাপ ছাড়াও আরও একটি সাপ ও কিছু সাপের চামড়া উদ্ধার করা হয়।—সংবাদ।

● গৃহপালিত প্রাণী সংরক্ষণ না করার জন্য কিন্তু আমার গিন্নিকে এখনও গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ!

সমস্ত আবহাওয়া অফিসে কলম ধর্মঘট শুরু হয়েছে।—সংবাদ।

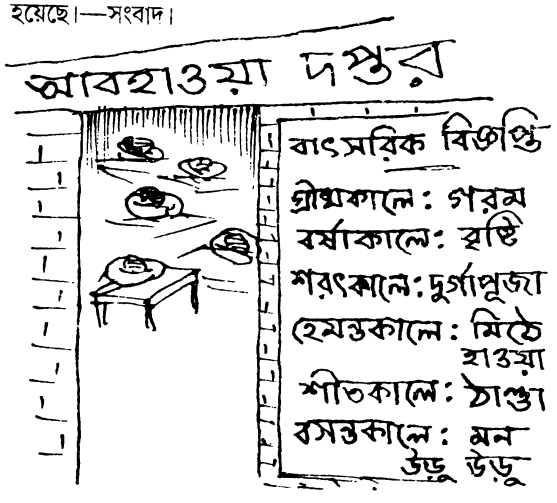

● তাতে ভয় পাবার কি আছে? ঋতু অনুযায়ী বার্ষিক আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি একবার জানিয়ে দিলেই তো আর সারা বছর কাজের দরকার হয় না। যেমন গ্রীষ্মকালে গরম পড়িবে, বর্ষাকালে বৃষ্টি হইবে ইত্যাদি।

বোলপুরের বিভাগীয় টেলিগ্রাফ অফিসে বসানো এম-টি-এম মেশিন বিকল হওয়ায় টেলেক্স-টেলিগ্রাম পাঠানোর কাজ শম্বুকগতিতে চলছে।—সংবাদ।

● এটা একটা সংবাদ হ'লো? 'Father seriously ill' টেলিগ্রাম আজ পর্যন্ত কে কবে ফাদারের মৃত্যুর পূর্বে পেয়েছেন মশাই?

বেসরকারী অনুষ্ঠান দেখানোর বিরুদ্ধে দূরদর্শন কর্মীরা বিক্ষোভ দেখানোয় পুরো একদিন দূরদর্শনে কোনও অনুষ্ঠান প্রচার হয়নি।—সংবাদ।

● ঠিকই করেছেন দূরদর্শন কর্মীরা। বেসরকারী চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান একবার চালু হলে কি আর দর্শকেরা সরকারী পাঁচন গিলবেন? দেখেন নি, অন্য চ্যানেলে মন্ত্রীদের চাঁদপানা মুখের খবর না দেখিয়ে ক্রিকেট খেলার ধারা বিবরণী বন্ধ করে খবর গেলানো হয়? নইলে ও খবর কি কেউ দেখতো?

সংবাদে প্রকাশ স্ত্রীর উপর শারিরীক নির্যাতনের অভিযোগে কলকাতা পুলিশের এক সাব ইন্সপেক্টরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

● একি অন্যায় কথা! গাড়ী চালক ও জনসাধারণকে নির্যাতন করার ট্রেনিং ও অভ্যাসের ফলেই তিনি স্ত্রীকেও সমান চোখে দেখেছেন। গণতান্ত্রিক এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে তাঁকে গ্রেফতার করা হবে কেন?

গড়বেতা থানার মাদপুর গ্রামে মাটির ঘর ভেঙ্গে একজন ঘুমন্ত মহিলাকে পদপিষ্ট করে মেরে ফেলেছে একটি বুনো হাতি।—সংবাদ।

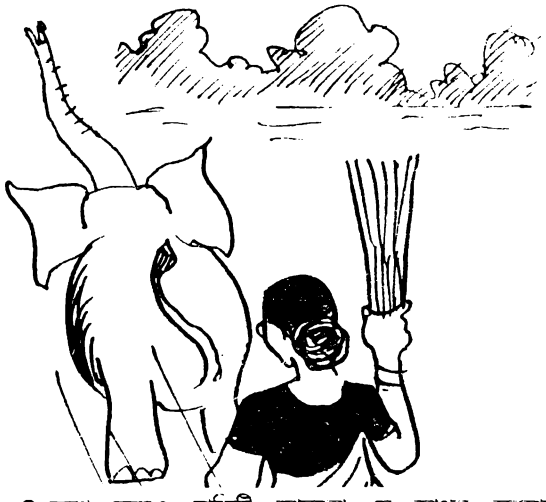

● বুনো হলেও হাতিটি জানতো যে জাগ্রত অবস্থায় কোনওমতেই কোনও মহিলার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব নয়।

পুলিশকে চাঙা করতে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ইন্সপেক্টার থেকে ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার অফিসারদের সঙ্গে এক একান্ত বৈঠকে বসছেন।—সংবাদ।

● ওই বৈঠকে ট্রাফিক পুলিশ ও লরীচালকদেরও ডাকা উচিৎ ছিল

জালিয়াতির অভিযোগে একজন পুরকর্মী সাসপেণ্ড হয়েছেন।—সংবাদ।

● যাক, ধরা না পড়ায় বাকীরা বেঁচে গেলেন এ যাত্রা।

চোরের
চোর
কার্টুন
Subhajit
এই বিশাল বাড়ীর দিকে চলেছেন চুরির উদ্দেশ্যে
কিন্তু বাড়ীতে ঢুকেই গৃহকর্ত্রীর চোখে পড়ে গেল চোরটা
ভয়ে দৌড়তে শুরু করল... কিন্তু গিয়ে পরল গৃহকর্তার সামনে।
আমার বাড়ী ঢুকেছিলে কেন ?
নিজের বাড়ী মনে করে
তাহলে... আমার স্ত্রীকে দেখে দৌড়লে কেন ?
নিজের স্ত্রী মনে করে। এত রাতে বাড়ী ফিরছি যদি বকে তাই দৌড়লাম

বাঃ দাদু, তোমাকে জিগ্যেস করলাম যে গণ্ডারের চাইতে কোন জন্তুর চামড়া মোটা আর তুমি রাজনৈতিক নেতার ছবিটা আমার দিকে ধরে কাগজ পড়তে শুরু করলে?
Kakoo

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অলকা ঘাড় নাড়ে। এটাও না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু ফুলের বাগান? ন্যাড়া বাসায় থেকে সুখ নেই। বাগান না হলে হবে না। না—কিছুতেই হবে না। তার চেয়ে গাড়ি ফেল হয়েছে বলে বাড়ি ফিরে তাস খেলা ভাল।

মুশকিলে পড়ে এবার প্রতুল। এদিক-ওদিক তাকায়। খানিকটা নিরুপায়-ভাবে বলে, বাগানটা হচ্ছে না—তাই তো, ফুল বাগানের কি করা যায়!

গভীর স্নেহে অলকার মুখখানা বুকের উপর নিয়ে এলো। বলে, বাগান না হোক, শতদল পদ্মফুল আছে একটি। আমার এই এক ফুলেই পুরো বাগান হার মেনে যায়।

আর কি বলবে এবার অলকা? কেঁদে না ফেলে এত আনন্দে! কোথায় ছিলে এদ্দিন লুকিয়ে সমুদ্রের মতো অকূল ভালবাসা নিয়ে? কলেজে পড়বার সময় অলকা হাসত ঠাকুরমার সেকেলে কথাবার্তায়—স্ত্রী নাকি জন্মজন্মান্তর ধরে একই মানুষকে স্বামী পেয়ে আসছে। আজকে মনে হচ্ছে, এমন খাঁটি সত্যি জীবনে কমই শুনেছে। যুক্তি-বিচারে নয়, মনের কানায় কানায় বুঝতে পারছে।

বন্ধ দরজায় টোকা। ধড়মড় করে অলকা উঠে বসে, আঁচল তুলে মাথার উপর দেয়। নিরালা বাসা হল তবে আর কোথায়, একটুখানি শোওয়া-বসার জো নেই—মানুষের উৎপাতে। মানুষগুলো যেন মুকিয়ে থাকে।

হোটেলের চাকর ডাকছে, বাবু—

বাবুটির উঠবার গতিক নেই, ডাক শুনে তিনি আরও চোখ বুঁজে পড়লেন। অলকা দরজা খুলে দিয়ে বলে, কি রে?

খেতে যাবার জন্য ডাক এসেছে। আর সমস্ত লোকের হয়ে গেছে—এরাই শুধু বাকি। কামরা অবধি তাই চলে এসেছে।

অলকা বলে, খেয়ে এসেছি আমরা। এ বেলা খাবো না।

প্রতুল তড়াক করে বিছানার উপর উঠে বসল। না হে, এককথায় জবাব দিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তুই বাপু একজনের মতো খাবার দিয়ে যা—তাই বাঁটোয়ারা করে নেওয়া যাবে।

আর অমল ঐ যে ফেরারী আসামী বলে ভয় ধরিয়ে গেছে, সেটা আনাগোনা করছে অলকার মনের মধ্যে। বলল, এখন বলে নয়—দু'বেলাই ঘরে খাবার দিয়ে যাবি। ডাইনিং-রুমে গিয়ে খেতে পারব না।

ঘরে খাবার দেবার নিয়ম নেই দিদিমণি, এক যদি বেশি রকমের অসুখ-বিসুখ হয়—

হেসে উঠে প্রতুল বলে, অসুখই তো রে—অতি সাংঘাতিক অসুখ। ওর আমার দু-জনেরই। দেখছিস নে, নড়ে বসবার তাকত নেই! তোর একটু কষ্ট—তা ঘাবড়াস নে, তার ব্যবস্থাও হবে।

ঠিক হ'ল তাই। অলকার আবার এক চিন্তা, অসুখ হলে তো সাবু-বার্লি দেয়। তাই যদি নিয়ে আসে এক বাটি?

প্রতুল বলে, ক'টা অসুখের খবর রাখো যাদু? আমরা তাবৎ অসুখের নাম-ধাম কুলশীলের ফিরিস্তি মুখস্ত করি। এমন অসুখও আছে, খাওয়া দুনো তেদুনো বাড়িয়ে দিতে হয়। এই যে আমাদের—এ-ও অসুখ একরকমের, ফার্মাকোপিয়ায় যদিও দাওয়াই বাতলে দেয় নি—

পরম আলস্যে আবার গড়িয়ে পড়ে।

দিন ক'টা ভালই যাবে পাটনায় তোমার এই বাপের বাড়িতে। আমার কিছু টানাপোড়েন আছে অবিশ্যি—দিনে দু-বার রাত্রে দু-বার আসা-যাওয়া। কিন্তু তুমি একেবারে রাজরাজেশ্বরী—দিনরাত গদিয়ান হয়ে থাকবে। সিঁড়িতে পা ঠেকাতে হবে না কোন বাবদে।

যেতে কি মন চায়? কিন্তু আর দেরী করা ঠিক হবে না। হাওড়া ষ্টেশনে গাড়িতে তুলে দেওয়া—গাড়ি অবশ্য প্রায়ই দেরী করে ছাড়ে আজকাল—তবু মোটের উপর একটা হিসাব আছে।

ঘড়ি দেখে প্রতুল বলে, যাই এবারে—কেমন? রাত্তিরে আসছি—একটু নিশুতি হয়ে গেলে তারপর—এই ধরো দশটা সাড়ে দশটা। শেষ রাত্রে আবার গিয়ে শুয়ে পড়তে হবে বাড়ির সকলের উঠবার আগে। দিনমানেও এই রকম। মাঝের সময়টুকু কেবল তোমার একা-একা থাকতে হবে।

অলকা আঁৎকে ওঠে, ওরে বাবা!

এমন কাপুরুষ! হোটেলে মানুষ গিজগিজ করছে।— আর অমলও তো আসবে মাঝে মাঝে-

তাড়া খেয়ে অলকা আর কিছু বলে না। তা বলে ভয় ঘোচে নি—মুখ শুকনো ক'রে রয়েছে।

দরজা বন্ধ ক'রে থেকো বরঞ্চ, বই-টই পড়ো। রাতে আসবার সময় দু-একটা বই হাতে করে আসবো।

অলকা জানালায় বাইরের দিকে চেয়ে। দু-হাতে জোর করে তার মুখখানা একেবারে সামনাসামনি এনে কাতর হয়ে প্রতুল বলে, হাসো। মাঝের এই পাঁচ—ছ' ঘণ্টা আমাকেও তো একলা কাটাতে হবে—হাসিমুখ না দেখে গেলে থাকব কেমন করে?

বেরুচ্ছে প্রতুল। ফটকের কাছে ভারী গোঁফওয়ালা এক ভদ্রলোক বললেন, ছুটছেন যে মশায়! ডাক্তারের কাছে বুঝি?

প্রতুল অবাক হয়ে তাকাল।

তিনি পরিচয় দিচ্ছেন, আপনার পাশের ঘরে আছি। পাকিস্তান থেকে

এসেছি—সৃষ্টিধর কর আমার নাম। মাসখানেক হতে চলল—তা মশায় একটা বাসা খুঁজে পাইনে। আপনার বাড়ি কোথায়?

ফস্ করে সত্যি কথাটা বেরিয়ে যায়, ভবানীপুর।

বলেই বেকুব।

অতিশয় সদালাপী ভদ্রলোক, সহজে ছাড়বার পাত্র নন। আত্মীয়ের ভাবে গদগদ কণ্ঠে বললেন, অসুখের কথা বলছিলেন কিনা চাকরটাকে—কি অসুখ?

তখন মালুম হল প্রতুলের। তর্কের মধ্যে না গিয়ে জবাব দেয়, কি অসুখ-ডাক্তার জানে। আমি তার কি বলব?

সৃষ্টিধর বলেন, না—তাই বলছিলাম, ভবানীপুরে বাড়ি থাকতে শ্যামবাজারে হোটেলে উঠতে হল কিনা!

কথার ধরণটা ভাল নয়। প্রতুল বলল, বাড়ি থেকে চিকিৎসার সুবিধে হয় না। ডাক্তারও থাকেন এদিকটায়—

আর কথা না বাড়িয়ে হন-হন করে সে চলল। ঠিক যে সৃষ্টিধরের ভয়ে তা নয়। নৃত্যলালেরও কোর্ট থেকে ফেরবার সময় হয়ে এলো।

নাঃ—যেমন ভাবা গিয়েছিল, তা নয়। বেশ হাসিখুসি অলকা। হোটেলের জীবন দুটো দিনেই রপ্ত করে নিয়েছে। প্রতুলকে সে-ই এখন শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, এত লোক গিজ গিজ করছে—ভয় আবার কিসের? দুয়োর বন্ধ করে থাকতে যে বলে, সেই মানুষ হ'ল কাপুরুষ!

এ জীবনের স্বাদ জানত না তারা আগে। দু-জনে মুখের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলে—কথা নয়, গানের গুঞ্জন। এত কথা কিসের রে বাপু? কথার শেষ নেই, মানেও হয় না। কথার মাঝে অলকার ঘাড় দোলানি, হীরের দুলের ঝিলিক দেওয়া, খিল খিল করে হেসে ওঠা ক্ষণে ক্ষণে। আরো যদি প্রতুল পাশ করে পুরোপুরি ডাক্তার হয়ে সত্যি সত্যি কোন গ্রামের নিভৃত কোয়ার্টারে বসতে পারত—উঃ, ভাবতে মন-দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে!

অলকা বলে, ছাতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। পাশের ঘরের ওঁরা পাকিস্তান থেকে এসেছেন। গিন্নিটি ভারি মিশুক—টেনে ওঁদের ঘরে নিয়ে বসালেন। পান খাইনে—তা জোর করে মুখের মধ্যে গুঁজে দিলেন একটা খিলি। বাসা খুঁজে খুঁজে হয়রান। স্বামীস্ত্রী আর একটি বাচ্চা ছেলে—কোন রকম ঝামেলা নেই। আমাদের পদ্মপুকুরের বাড়িটা তো খালি পড়ে আছে—বাবাকে বলে দিয়ে দেবো খান দুয়েক ঘর।

প্রতুল ব্যস্ত হয়ে বলে, সে সব বলাটলা হয়ে গেছে? অলকা বলে, তা বলতে যাবো কেন? বোকা নাকি! কত আলাপ-পরিচয় করলেন! ওঁর নাম তরলা, আমি কিন্তু নামটাও বলিনি। বললাম, পাটনায় বাড়ি—কলকাতা দেখতে এসেছি হপ্তাখানেকের জন্য। কেমন বানিয়ে বলতে পারি,

ওয়ান্স আপন এ টাইম
কাহিনী ও অঙ্কন :
রজত কান্তি সরকার
আরে আমালে, ছুঁয়ে দিস না। নোংরা কোথাকার। অরে দাঁড়া।
কিসের বকশিস? আরেকটু হলে আমার জামাকাপড় সব নষ্ট করে দিচ্ছিলিস।
RAJAT

দেখ।

এই সেরেছে! আমি যে বললাম, বাড়ি ভবানীপুরে—

অলকা হেসে উঠে হাততালি দেয়, কি বোকা রে? মেজদার কথা মনে নেই? ফেরারী আসামী আমরা—খাঁটি কথা বলতে আছে? বাড়ির নম্বরও বলে ফেলেছ বোধ হয়!

আর ওদিকে সুহাসিনীও বড্ড খুশি। কর্ত্তার কাছে দেমাক করেন, কি বলেছিলাম? বউমা যাবার পর লেখাপড়ায় ছেলের কি রকম মন হয়েছে দেখ। সব কথা তোমায় বলতাম না—আগে তো নানান ছুতোয় কলেজ কামাই। এখন দশটার সময় খেয়েদেয়ে বইয়ের গাদা নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে। দশ মিনিট আগে হবে তো পরে নয়।

ছেলের সুবুদ্ধিতে নৃত্যলালের খুশি হওয়া উচিত। তবু মন খুলে সমর্থন করতে পারেন না।

তা বললে হবে কেন গিন্নি? বউমা কি কলেজের পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকত? কড়া নজর থাকলে বাপ-বাপ বলে কলেজে যেতে দিশা পেতো না।

তা দুপুরটা তুমি পড়ে পড়ে ঘুমুবে আর আমি কোর্টে মক্কেল তাড়িয়ে বেড়াব। হবেই তো ঐ রকম। নিজেদের কিছু নয়—দোষ দিচ্ছ এখন পরের মেয়ের।

অভিনিবেশ দিবাভাগে শুধু নয়—রাত্রি বেলাতেও। এ বাড়িতে সন্ধ্যার পরেই খাওয়ার রেওয়াজ। খাওয়ার পরে প্রতুল বাইরে এক তিল সময় কাটায় না। অলকা ভয় পাবে, তাই মড়ার হাড়গোড় বাইরের ঘরে ছিল। সমস্ত শোবার ঘরে নিয়ে তুলেছে। বই-খাতাপত্রও সেখানে। খেয়ে দেয়ে সে ঘরে গিয়ে ঢোকে।

নৃত্যলাল তবু খুঁৎ খুঁৎ করেন, দুয়োর-জানালা এঁটেসেটে দেয় কেন বল দিকি?

সুহাসিনী বলেন, শীতকাল কিনা! ও আমার বড় শীতকাতুরে—লেপের মধ্যে হাত-পা ঢুকিয়ে আরাম করে পড়ে।

আরাম করে ঘুমিয়ে পড়ে না, ঠিক জানো?

একটা জরুরী মামলার ব্যাপারে সেদিন রাত বেশি হয়ে গেল। বিলাতী নজির ঘাঁটছেন। ইংরেজি ভাষার অনেক মারপ্যাঁচ—একটা কথার বিশ রকম মানে দাঁড় করানো যায়। ঠিক কোন্ জিনিসটা বোঝাচ্ছে এখানে, নৃত্যলাল ভাবতে ভাবতে দিশা করতে পারেন না। বাইরে এলেন। জ্যোৎস্না ফুট ফুট করছে। ঘরের ভিতর কাজের মধ্যে এসব বোঝা যায় না।

প্রতুলের ঘরের সামনে গিয়ে ডাকেন, এই—শুনতে পাচ্ছিস? ভাল ডিক্সনারি কি আছে তোর কাছে, একটা কথার মানে আটকে যাচ্ছে—সাড়া নেই। এই রকম পড়া পড়ছে বটে—তারই দেমাকে সুহাসিনী বাঁচেন না!

দরজায় ধাক্কা দিচ্ছেন। তারপর ঠাহর হল, বাইরে থেকে শিকল দেওয়া। গেল কোথায় তা হ'লে—কি হ'ল? ঘরে গিয়ে বসলেন। অনেকক্ষণ বসে রইলেন—দেখা নেই। চতুর্দ্দিকে ঘুরে ফিরে দেখে এলেন। ঠিকই আছে, সদর দরজা বন্ধ।

রাত থাকতে প্রতুল যথারীতি পাঁচিল টপকে এলো। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখে, শিকল খোলা। বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। খুলল কে শিকল? তার বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে অঘোরে নিদ্রা দিচ্ছে—সর্বনাশ, আরে সর্বনাশ! নৃত্যলাল অপেক্ষা করতে করতে শুয়ে পড়েছেন ঐখানে। তারপরে ঘুম—

বাপের মুখোমুখি না পড়ে—প্রতুল বাইরের ঘরে গিয়ে বই নিয়ে বসল। আর মনে মনে নানারকম কৈফিয়ৎ ভাঁজছে। নৃত্যলাল উঠে তারপর বৈঠকখানায় এলেন তো সুড়ুৎ করে সে চলে গেল ভিতরে। বাপে ছেলেয় লুকোচুরি চলছে যেন। নৃত্যলাল এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি কাউকে—সুহাসিনী অন্নদা কেউ কিছু জানেন না। প্রতুলের ভয় আরও বেড়ে যায়, দুরন্ত অভিমানে চোখে জল আসবার মতো। বাবা, তুমি কি ভেবে বসে আছ? তোমাদের হাকিমরা অতি ঘৃণ্য আসামীরও জবাব জেনে নেয়—আর আমায় ডেকে একটা মুখের কথা জিজ্ঞাসা করলে না!

নৃত্যলাল কোর্টে চলে গেলেন। এবং রোজ যেমন কলেজে যায়, প্রতুলও বেরুল। সোজা একেবারে অমলের হোষ্টেলে। সে নেই—কোনদিন থাকে না এমন সময়। জানা আছে প্রতুলের—কিন্তু ঐ কাণ্ডের পর বাপের চোখের উপর দিয়ে সকালবেলা বেরিয়ে আসে কেমন করে? ফিরবে কখন অমল? তার কোন ঠিকঠাক নেই। আচ্ছা, রইলাম বসে—

সৃষ্টিধর দুপুরবেলাটা টো-টো করে বেড়ান, আজকে ঘরে আছেন। তরলা বলছিলেন, ছেলেটার অসুখ-অসুখ—সেইজন্যে নাকি? দু-জনে যেন বচসাও বেধে গেছে।

অলকার মজা লাগে। স্বামী-স্ত্রী হলেই কি এই? তাদের এখনো এদিন আসেনি—কিন্তু আসবে ঠিক বিয়েটা কিছু বাসি হয়ে গেলে।···প্রতুলের আসার সময় হয়ে গেছে, আসে না কেন আজ এখনো? একা একা বই পড়তে ভাল লাগে না।—তা এই এক কাজ হল অবিশ্যি, লুকিয়ে লুকিয়ে, ওঁদের ঝগড়া শোনা। কথাগুলো মুখস্থ করে নিতে হবে, ঝাড়তে হবে প্রতুল এলে তার উপর। সেই কতক্ষণ থেকে তোমার পথ তাকিয়ে আছি,—কথা বলব না তো, একটা কথাও নয়।

কান পেতে শোনে, কি বলছেন ওঁরা। সর্বনাশ, তাদের কথাই যে! ছেলেটার কি একটু ইনফ্লুয়েঞ্জার মতন হয়েছে—সৃষ্টিধর তাই নিয়ে তিলকে

তাল করছেন।

কেন যাও ও-ঘরে তুমি? কিসে কি হল, কে জানে? দেশঘর ছেড়ে এই তো পথে পথে বেড়াচ্ছি। এর উপর যক্ষ্মার ছোঁয়াচ যদি কুড়িয়ে নিয়ে এসো—

সভয়ে তরলা বলেন, কার যক্ষ্মা?

ঐ যে বউটা, যার সঙ্গে গলায় গলায় ভাব তোমার—

তরলা বলেন, কি বলছ? গোলগাল কেমন সুন্দর চেহারা—তার যক্ষ্মা হতে যাবে কেন?

ও রোগের লক্ষণই এই। বাইরে নাদুস-নুদুস, ভিতরটা ঝাঁঝরা। ভবানীপুরে বাড়ি—তা বাড়ির লোকে দূর করে দিলে, শেষটা এই হোটেলে এনে তুলতে হয়েছে—

তরলা প্রতিবাদ করেন, বাড়ি তো পাটনায়। বউ আমায় নিজে বলেছে।

সৃষ্টিধর বলেন, বোঝ তাহলে। স্বামী বলে ভবানীপুর বাড়ি, বউ বলে পাটনায়। পাপ না থাকলে ঢাকাঢাকি করতে যাবে কেন?

কলকাতার শহর দেখতে এসেছে নাকি পাটনা থেকে! আমি তাতে বললাম, ঘর থেকে তো একলহমা বেরোও না ভাই, জানলা দিয়েই শহর দেখছ নাকি?

সৃষ্টিধর বলেন, তাগত আছে বেরোবার? হাঁটাহাঁটি করলেই মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরুবে—ও ব্যাধির এই নিয়ম।

অলকার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে যায়। প্রতুল বলছে এই কথা—সত্যি নাকি তার এই অবস্থা? টি-বি-রোগের প্রধান লক্ষণই, শোনা আছে, রোগী নিজে কিছু সন্দেহ করে না, সে ভাবে, চমৎকার স্বাস্থ্য তার—

বিকালের দিকে ছেলের জ্বর বাড়ল। তিনটি মারা গিয়ে তার পরে এই গুঁড়ো। সৃষ্টিধর ক্ষেপে গেছেন। যত অপরাধ যেন অলকার। বিষম চেঁচামেচি লাগিয়েছেন, বিষ ছড়ানো হচ্ছে হোটেলে অধিষ্ঠান করে। নিজে তো যাবেই, সাথেসঙ্গে আরো দু-পাঁচটাকে যদি সাপটানো যায়।

তরলা সামলানোর চেষ্টা করছেন, আঃ—হচ্ছে কি বলো তো? আমি বলছি, মিথ্যে সন্দেহ তোমার। রোগপীড়া কিছু নয়। ভদ্রলোক ঠাট্টা করেছেন তোমার কাছে। কিংবা অন্য কিছু হতে পারে।

বলো, কি তাহলে? ইনি একরকম বলেন, উনি অন্যরকম। ডাকাতির আসামী? না-কি ইলোপমেণ্ট—স্বামী-স্ত্রী সেজে লুকিয়ে রয়েছে। পাজির পা-ঝাড়া হল ম্যানেজারটা—টাকার লোভে পাপ এনে ঢুকিয়েছে। হোটেলে

কত ভাল মানুষ আসে, মেয়েছেলে নিয়ে আছেও কতজনা! দূর করে দেবো আজকেই ওদের। ম্যানেজার না শোনে—আমরা নিজেরাই বিহিত করব। উপর-নীচে জন পঞ্চাশ তো হবো—এ সমস্ত যে শুনবে, সে-ই ক্ষেপে যাবে।

অলকা আর দাঁড়াতে পারে না, ফিরে এসে ধপাস করে বসে পড়ল। উঃ, কখন আসবে তুমি? আসবে না আজকে মোটেই? সেই দুপুর থেকে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলে বুক কেঁপে ওঠে। ঘাড় ধরে এই বের করতে আসে বুঝি জন পঞ্চাশ! কি করবে সে এখন, কি উপায়? মেজদাটাও এসে পড়ত যদি—ঈশ্বর মেজদাকে না হয় এনে দাও—

অমল হোষ্টেলে ফিরে দেখে প্রতুল বসে আছে। উস্কো খুস্কো চেহারা।

সমস্ত শুনে সে হাসতে লাগল।

কর্ত্তা ভেবেছেন, বউ বিহনে তুই বখে গেছিস। তাই চুপচাপ আছেন। ছেলের কেলেঙ্কারি নিয়ে তো ঢাক পেটানো যায় না!

প্রতুল আহত কণ্ঠে বলে, এত বছর ধরে মানুষ করলেন—বাপের এই বিশ্বাসটুকু নেই ছেলের উপর?

বিয়ের আর একটা ঘাড়ে চাপে, তখন থেকে মানুষ চতুষ্পদ হয়ে যায় কিনা!

হাসি থামিয়ে অতঃপর অমল গম্ভীর হ'ল, অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠেছে ভাই। আর কাজ নেই—পাটনা থেকে ফিরে আসুক এবার অলকা—

প্রতুল বলে, ফিরতেই হবে—না ফিরে উপায় আছে কিছু? এর পরে আর আমার রাতে বেরুনো হবে না। আর দিনমানেও আটকে ফেলবে কিনা, কে জানে?

ফোঁস করে এক নিশ্বাস ফেলল।

একটা হপ্তা থাকব বলে এসেছিলাম, দু'দিনে সব শেষ। হোটেলের এই দুটো দিন অক্ষয় স্মৃতি হয়ে রইল। একটা বড় শিক্ষা হ'ল—বাপের ভাতের উপর থেকে যে বিয়ে করে, সে হ'ল এক নম্বর আহাম্মক।

আবার তাগাদা দেয়, ওঠ্ তাহলে। বোনকে পৌঁছে দিয়ে আয় পাটনা থেকে। সেই এগারোটা থেকে আমি ধন্না দিয়ে আছি—

অমল ঘাড় নাড়ে, উহু—আসব কিসে? ওদিক থেকে একটা ট্রেনও এ সময়ে নেই—

ঊর্ধ্বমুখী হয়ে একটুখানি হিসাব করে বলল, সকালবেলার আগে কোন উপায় নেই ভাই। ঐ সময় দিল্লী এক্সপ্রেস এসে পৌঁছবে।

প্রতুল বিরক্ত কণ্ঠে বলে, দুত্তোর! আবার ঘণ্টা দশ-বারো দেরি পড়ে গেল। হোষ্টেলে তবে বলে কয়ে চল—ঐখানে রাতে থাকবি। বিষম ভীতু তোর বোন—এতক্ষণ কি করছে কে জানে? বাহাদুরি কেবল আমাদের কাছে!

সৃষ্টিধর ম্যানেজারের অফিসে হামলা দিয়েছেন। রীতিমতো একটা দল-সঙ্গে।

যে আসবে, তাকেই অমনি জায়গা দেবেন? খবরবাদ নেবেন না, কি মতলবে আসছে বুঝেসমঝে দেখবেন না—টাকা গুণে দিলেই হয়ে গেল!

এক একজনে এক এক রকম বলে। জবাব দিতে গেলে আরও ক্ষেপে যায়। এই মারে তো এই মারে! বিপন্ন ম্যানেজার এমনি সময় প্রতুলকে দেখে অকূল সমুদ্রে যেন কূল পেলেন।

আসুন—এই দিক দিয়ে হয়ে যাবেন মশায়। আপনার বাড়ি কোথায় শুনিয়ে দেন তো ভদ্রলোকদের—

প্রতুল বলে, ভবানীপুর—

আপনার স্ত্রী বলেছেন পাটনায়। আরও নানান রকম উল্টোপাল্টা কথা। আমি যে মারা যাচ্ছি মশায় সেই ঠেলায়!

তার বাড়ি সেখানে—মানে বিয়ের আগে পর্য্যন্ত বরাবরই ছিল কিনা! অভ্যাস বশে বলে ফেলেছে।

সৃষ্টিধর বলেন, রোগী এনে তুলেছেন—কি রোগ সেটা ঠিক করে বলুন। ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রপশন দেখান। নইলে ছাড়াছাড়ি নেই। এমন রোগ যে বাড়িতে থেকে চিকিৎসা করতে দিল না—

অমল পিছনে পড়ে ছিল, ভিড় ঠেলে তাড়াতাড়ি সামনে এসে বলে, রোগ আর নেই। বাড়িতেই ফিরে যাচ্ছে। দুটো দিনেই বেশ ভাল রকম চিকিৎসা হয়ে গেছে।

ম্যানেজার চম্‌কে ওঠে, হপ্তার কথা বলে ঘর নেওয়া হ'ল যে?

হপ্তার টাকা মিটিয়ে দিয়ে কাল সকালেই চলে যাচ্ছি আমরা। অসময়ে কোথায় যাই—রাতটুকু শুধু রেহাই করুন আপনারা।

কথা পেয়ে সকলে নরম হল। আর সত্যি যে অসুখ-বিসুখ, বউটাকে যারা চোখে দেখেছে—তাদের সেরকম মনে হয় না। তরলা এসে এমনি সময় ডাকলেন, ছেলে খুব ঘামছে—জ্বরটা ছেড়ে যাচ্ছে এইবার।

সকালবেলা অলকা এসে শ্বশুরের পায়ে প্রণাম করল।

চোখে দেখতে পেয়েই মন জুড়িয়ে যায়। নৃত্যলাল গাঢ় স্বরে বললেন, আয় মা। ক'দিন ছিলিনে—বাড়ি একেবারে অন্ধকার। তাসের আড্ডা তুলে দিয়েছি—

অলকার নিজের কোট—হোটেলের সেই ডাঙ্গার মাছের অবস্থা নেই। কালকের কান্নার পর ঝিকিমিকি হাসি এখন। হেসে মুখ-চোখ নাচিয়ে বলে, আমারও কি ভাল লাগছিল? তাই দেখে বাবা বললেন, কাজ নেই—তোর

নিজের বাড়ি চলে যা। মা দুঃখ করতে লাগল, এতকাল খাইয়ে পরিয়ে দু-মাসের মধ্যে মেয়ে পর হয়ে গেল। মেজদা ফিরে আসছিল, তারই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন দিল্লী এক্সপ্রেসে—

ও বেহাই, মা-জননী এসে গেছে এই যে! আপনি বললেন, যায়নি মোটে পাটনায়। আপনারা এক ট্রেনেই তো আসছেন—

সবিস্ময়ে অলকা বলে, বাবা এখানে?

হ্যাঁ, কালকে টেলিগ্রাম করে দিলাম তোকে নিয়ে চলে আসবার জন্য। ব্যস্ত হয়ে উনি একাই চলে এসেছেন। কই, অমল গেল কোথায়?

অমল গতিক বুঝে চক্ষের পলকে সরে পড়েছে। আর প্রতুল এ সমস্ত কিছুই জানে না—বাইরের ঘরে মহাশব্দে সে পাঠাভ্যাস করছে। শক্ত এগজামিনের পড়া—বাজে ব্যাপারে মন দিলে চলে না।

AMRITA BAZAR PATRIKA

In Troubled Waters

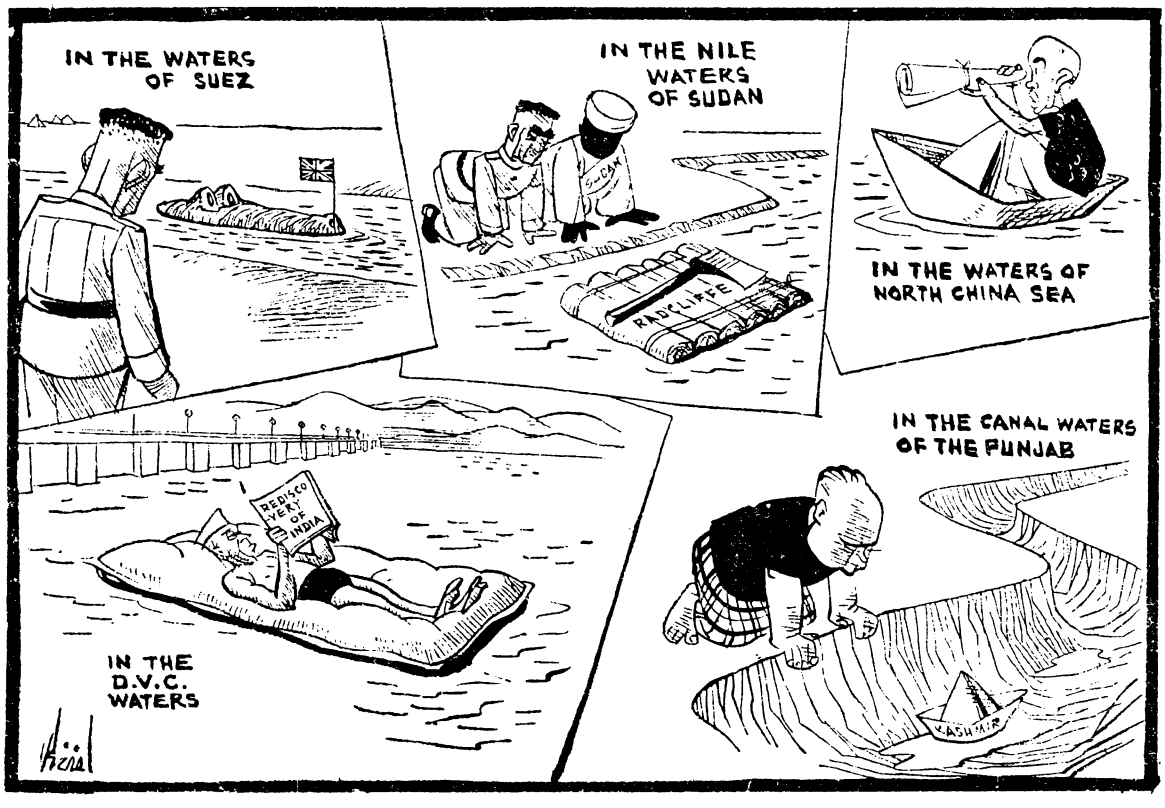

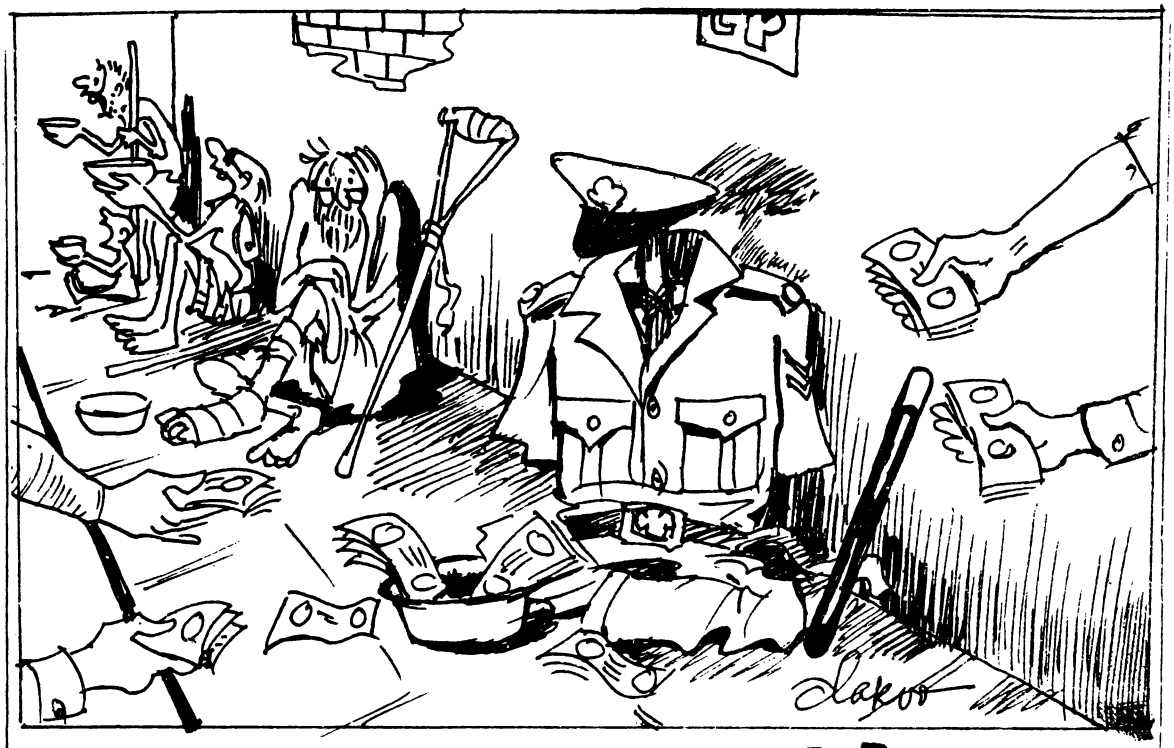

কাকে সরালে এই রাজনৈতিক জটিলতা কমে বলতে পারেন?—সংবিধান।

হাসির অফুরন্ত ফোয়ারা যাদের তাদের কি বলবেন?—Hussy নয়।

প্লেন টক

বোম্বে থেকে কলকাতা ফেরার পথে রাস্তায় প্লেনের একটা ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেল। আমি ও আমার স্ত্রী ছাড়া আর সব যাত্রীরা ঘুমিয়ে ছিলেন। এয়ার হোস্টেস আমার কানে কানে বলে গেল প্লেন বোম্বে ফিরে যাচ্ছে। বোম্বে এরোড্রোমে প্লেন নির্বিঘ্নে নামার পর পাইলট এসে আমার স্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, 'আপনি খুব সাহসী তাই চেঁচামিচি করেননি।' আমি সগর্বে পাইলটকে বললাম, 'হ্যাঁ ও অল্পে ভয় পাওয়ার মেয়ে নয়'। একটা অস্বাভাবিক শব্দ শুনে ফিরে দেখলাম স্ত্রী মাটিতে বসে—আঁ আঁ করে চীৎকার করছেন। জিজ্ঞাসা করলাম কি হল'?

স্ত্রী—আমি ভেবেছিলাম পেট্রল বাচাবার জন্য একটা ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছে—ওগো আমার মাথায় একটু জল দাও।

দোকানের কর্মচারী—গনেশ কে দিয়ে আর কাজ চলছে না, একেবারে কালা হয়ে গেছে। বিদেয় করে দিল।

মালিক—না, না ওকে বিদেয় করতে হবে না। সাধারনের নালিশ শোনবার জন্য যে ব্যবস্থা আছে সেখানে ওকে বসিয়ে দাও।

— হাসিটুন —

সঞ্জীব সিংহ

মেসোমশাই দ্যাখো সুশান্ত····তুমি যদি ফের আমার মেয়ে ক্ষমার নাম মুখে আনো তাহলে চাবকে পিঠের চামড়া আস্ত রাখবো না।

সুশান্ত না, মেসোমশাই, সত্যি আমার খুব ভুল হয়ে গেছে। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

মেসোমশাই কি ফের তুমি ক্ষমার নাম মুখে আনলে! এ্যাই কে আছিস্····

নীপা জানো অজয়দা, আমাদের মিহিরদা খুব কথায় কথায় হাসাতে পারে।

মিহির তুমি ঠিকই বলেছ নীপা। আমি হাসাতে পারি তাই আমি তোমার হাস্যাস্পদ আর অজয় প্রেমাতে পারে তাই সে তোমার প্রেমাস্পদ।

পুত্র বাপি, তুমি রেগে গেলে ইংরিজীতে কথা বল কেন?

পিতা হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে····?

পুত্র সাহেবরা কি রেগে গেলে বাংলায় কথা বলে?

পিতা Oh! don't be silly my boy!

('পত্রাঘাত' বিভাগে উত্তর পাবার জন্য সরস চিঠি লিখুন। বুদ্ধিদীপ্ত মজার চিঠি লিখলে সরস উত্তর পাবার সুযোগ থাকে। ব্যক্তিগত বিষয়ে লেখা বা আঁকা মনোনীত হলো কিনা তা 'পত্রাঘাত' বিভাগে ছাপা হবে না।
প্রতিমাসে বিভাগে যে শ্রেষ্ঠ পত্র লেখককে সেই সংখ্যা বিনামূল্যে পাঠানো হবে।)

শুভাশীষ রায় কোলফিল্ড ল্যাবরেটরী, ঝরিয়া (ধানবাদ)
শ্রীমান রসগোল্লা বাবু,

সর্বাঙ্গে রস মেখে রসগোল্লার মত রসময় হয়ে আপনি রস ছড়িয়েই চলেছেন। এদিকে দেখছেন না যে দু'পয়সা আমদানি করার জন্য পত্রিকার দোকান খুলে যে প্রচেষ্টা আপনি চালাচ্ছেন, তা লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবার মত সাইকিয়াট্রিস্টরা মেরে দিচ্ছে। আজ রাঁচীর পাগলা গারদে আর একটি মেহমান এল। নাম সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়। অবশ্য তাঁর পরিচয় পাবার আগেই বুঝতে পেরেছি যে উনি আমার মতই ভুক্তভোগী। কারণ আমার হাতের সরস কার্টুনটি (ফেব্রুয়ারী '৯৩) দেখেই উনি অ্যাঁ অ্যাঁ করে চেঁচিয়ে ওঠেন।

রসগোল্লা বাবু, একটা অনুরোধ করি—অবশ্য এ সাহস আপনার 'ঘোষণা' পড়েই পেয়েছি। হাব ভাব দেখে মনে হচ্ছে ব্যবসার পসার ভালই হচ্ছে, তা না হলে এই দুর্মূল্যের বাজারেও দাম কমাবার হুমকি। তাই বলছিলাম, আপনি যদি কয়েক কপি 'সরস কার্টুন' ফ্রি-তে পাঠিয়ে দেন তো ওগুলো নিয়ে অযোধ্যায় যাব আর বিতর্কিত পরিসরের চারধারের বেড়ায় লাগিয়ে চলে আসব, বুড়ো বয়সে একটু পূণ্য করার তাগিদে। সবাই ওখানে রেগে মেগে যাবে, আর হাসতে হাসতে ফিরে আসবে।

● সত্যজিৎ বাবুর সঙ্গী সংখ্যা যে রেটে বাড়ছে তাতে গ্রাহক সংখ্যা বাড়লেই এখন আতঙ্ক হয়। এই আতঙ্কটা আরও বেড়েছে যখন আপনার আগেই একজন অযোধ্যার বিতর্কিত স্থানে 'সরস কার্টুন' লাগিয়ে আসে। তারপরেই ক্ষেপে যাওয়া করসেবকদের হাতে বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ এবং হাজার হাজার 'সরস কার্টুন' এর পাঠক বৃদ্ধি! দোহাই আপনার আর ফ্রি কপি কেন, বেশী দাম দিয়ে কিনেও 'সরস কার্টুন' কোথাও লাগাবেন না। লাগালে এবার 'সরস কার্টুন' অফিসটিও ধরাধাম থেকে বিলুপ্ত হবে। দয়া করে ঘরে বসে লুকিয়ে পড়ুন আর পরপর রাঁচীতে জমায়েৎ হোন। ওখানে শুনেছি মোটা লোহার গরাদ আছে।

মিহির কান্তি রায় মহেশদাঁড়ি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা-৭৪৩ ৬০৯

আপনি দাম কমাতে চেয়েছেন দেখে মনে হ'ল আপনি ঠেকে শিখেছেন। চার টাকায় 'বর্তমান' এর মত পত্রিকা পাওয়া যায় আর ৫ টাকায় তাও শারদীয় সংখ্যার দাম বাইরে রেখে ভুল করেছেন। 'সন্দেশ' প্রভৃতি অনেক পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার জন্য বিশেষ মূল্য দিতে হয় না। সে জন্য তারা গ্রাহক বেশী পায়। আর আপনি আকাশ ছোঁয়া দাম চাইলে আমরা অপারগ হয়ে যাই। তবু যদি বছরে ৩/৪টি সংখ্যায় লেখা ছাপা হয় তো বেশী টাকা দিয়ে সাহায্য করা যায়।

● চার টাকায় 'বর্তমান' পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সেটা 'সরস' কি? মির্জাপুর স্ট্রীটে ওজন দরে কাগজ পাওয়া যায়। 'সরস কার্টুন' এর বদলে সেটা কিনলে অনেক সস্তা পড়বে। আর অপ্রকাশযোগ্য লেখা ছেপে আমরা পয়সা নিই না। নিলে মির্জাপুরের দরেই পত্রিকা দিতে পারতাম।

সমর মাজী চক বরহানপুর, চন্দনদহ-৭৪৩ ৫০৩, দঃ ২৪ পরগণা

সরস কার্টুনে এবার স্বদেশী বা বিদেশী উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করুন। আর বাংলাদেশের কার্টুন যা প্রকাশিত হচ্ছে, ভাল লাগছে না।

● সবাই সব সংখ্যা ঠিকমত সংগ্রহ করতে পারেন না বলেই

আমরা ধারাবাহিক কিছু ছাপতে চাই না। তাতে অন্ততঃ প্রতিটি সংখ্যাই স্বয়ং সম্পূর্ণ হয় এবং যে কোনও একটি সংখ্যা পড়লেই পুরো স্বাদটা পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের কার্টুন সম্পর্কে এত প্রশংসা এবং আরও ছাপবার অনুরোধ এসেছে যে আপনার তা ভাল না লাগা দেখে আপনাকে ডাক্তার দেখাতে বলতে ইচ্ছে করছে।

বিজন মজুমদার স্টক ভেরিফিকেশন ইউনিট, আই-আই-টি, খড়্গপুর

আজকাল মানুষের মতিগতি বোঝা দায়। 'সরস কার্টুন' পড়ে হাসবে না। কিন্তু যদি বলি মাসে একশো গ্রাম মাছ কম কিনে সঃ কাঃ কেনো তখন হাসবে। হাসবে আমার বাতুলতায়—বাঁকা হাসি এ মা— কি বলে রে!

● এবার সঃ কাঃ-র সাথে ১০০ গ্রাম করে মাছ দেব বলে দেখুন। বলবে মাছটা দিন, সঃ কাঃ-টা চাই না।

চঞ্চল রুদ্র রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগণা

এবার দেখলাম আপনাদের প্রেসের ভূত আমার পদবীকে (রুদ্র) পদচ্যুত করে 'রায়' করে দিয়েছে। যদি একটু দেখেন যাতে ভূতটি আর কাউকে পদচ্যুত না করতে পারে তবে নির্ভয় হই।

স্টলে দেখি আরও পাঁচটা বহু পরিচিত পত্রিকার ভিড়ের মধ্যে 'সরস কার্টুন' এর মাথাটা কোনও রকমে বেরিয়ে থাকে। এতে পরিচয় না থাকলে 'সরস কার্টুন'কে ভিড়ের মধ্যে আলাদা করা মুস্কিল।

● প্রথম অভিযোগটির জন্য মরমে মরে আছি। ব্যাটা ভূত কখন যে কি কর্ম করে অপদস্থ করে ফেলে তা সব সময় ধরতে পারি না। এবার ওটাকে কুকুরের লেজ সোজা করার কাজে লাগাব ভাবছি।

দ্বিতীয়টির বিষয়ে বলি, 'সরস কার্টুন' এর মাথাকে পুরো ধড় শুদ্ধ স্টলে সাজাতে হলে তাকে আর পাঁচটা বহু পরিচিত পত্রিকা করে তুলতে হবে আপনাদেরই। অন্ততঃ রোজ যদি ১০/২০ জন স্টলে এসে 'সরস কার্টুন' আছে কিনা খোঁজ করতে থাকেন তবে বহু পরিচিত ভেবে তারা ধড় শুদ্ধ গোটা পত্রিকাটা সামনে সাজাবে—তার আগে নয়। আমি শত বললেও নয়।

অনিমেষ অধিকারী হাটকালীগঞ্জ, উলুবেড়িয়া, হাওড়া-৭১১ ৩১৫

আপনার মত আমার একটা অবিজ্ঞান সম্মত নাম দিলে খুব খুশি হব। যাই হোক, আপনার 'সরস কার্টুন' বেখেয়ালবশতঃ সামান্য একটু আড় করাতে প্রচুর (চ)রস গড়িয়ে পড়ল। তা দেখে পাড়ার এক সবজান্তা দাদা (আপনার মত গুলবাজ) একঝুড়ি উপদেশ দিলেন—ওসব বাজে বই পড়িস না, পড়লে ৪২০ হয়ে যাবি। ঐ সবজান্তা দাদাটিকে একটু উজবুক বানাবার জবাব বলে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

● তাঁকে চরস গেলাবার মত ধরে 'সরস কার্টুন' গেলান।

মোহন রায় ঝরিয়া, লালবাজার, ধানবাদ-৮২৮ ১১১

ভেবেছিলাম 'সরস কার্টুন' রসকস হারিয়ে ভবপারে রওনা হয়ে গেছে আর আপনি দপ্তরে বড় সাইজের তালা ঝুলিয়ে আয়েস করে নিদ্রা যাচ্ছেন। হঠাৎ জানুয়ারী '৯৩ সংখ্যা পেয়ে আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছে। একটা বিষয় দেখে খুব আনন্দিত হলাম। সেটা দাম কমানো দেখে। হুঁ হুঁ বাবা, এতদিনে ব্যবসার টেকনিকটা শিখেছেন দেখছি! মনে হচ্ছে আপনার মাথাটা বিগড়েছে।

● জানেনই তো মরার বাড়া গাল নেই। আপনারা মর মর বলে চলেছেন বলেই 'সরস কার্টুন' মরতে পারছে না। তাই কথায় বলে 'কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না।

আমার মাথাটা যে বিগড়েছে তা সত্যজিৎ বাবু, শুভাশীষ বাবুদের মত পাঠকদের রাঁচীতে ভিড় করা দেখেও বুঝতে পারছেন না? না পারলে গিয়ে দেখুন।

সুমন দে ৫/৬৪ দমদম রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩০

আবার ডাকুর কার্টুন ও ফিচার দেখে চোখ জুড়াল। 'আড়চোখে' সূক্ষ্ম হুল মেশানো। সমর মাজীর 'বাঘা তেঁতুল' ভাল লাগলো। 'চমকং বালভাবিতং' রাশিয়ান পত্রিকা 'মিশা'তে প্রকাশিত জোক্সের ছাপ সুস্পষ্ট এবং অতি নিম্নমানের। মনোজ বসুর 'একটুকু বাসা' চমৎকার। ছাপার প্রিন্ট পুরনো দিনের ছাপার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সঙ্গীতা বসুর লিমেরিক বহু ব্যবহারে জরাজীর্ণ। জীবেশ ভট্টাচার্যের প্যারোডি ও দুই অমলবাবুর ছড়া ভাল লাগলো। 'সরস দূরদর্শন' মাঝে মাঝে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেলেও সরস ও সুখপাঠ্য। সুকুমার-ডাকুর যৌথ প্রচেষ্টায় তৈরী কার্টুন ফিচার অনায়াসে বাংলাদেশী ফিচারের সাথে পাঞ্জা লড়তে পারে।

● সুচিন্তিত মতামতের জন্য ধন্যবাদ। তবে এত খুঁটিয়ে পড়লে শেষে সত্যজিৎ বাবু ও শুভাশীষ বাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্যে রাঁচীর ট্রেন ধরবেন না তো?

ঘাতকের ভূমিকায়

অম্লান তলাপাত্র

উপযুক্ত পরিমানে নুন-ঝাল-মিষ্টি দিলে টকের আর টকত্ব থাকে না, মানে নাটক; আচার বলতে আপত্তি নেই। জীবনের সুখ-দুঃখ হাসি কান্না পরিমান মত মশলা সহযোগে মঞ্চে দুললে তাও নাটক। মঞ্চও আবার নানা কিসিমের—কারো একদিক খোলা কারো দুই বা তিন, বা চারিদিকই। কোনটা নিচের থেকে উপরে ওঠে কোনটা আবার বনবন করে পাক খায়। বেতার নাটক, শ্রুতি নাটকে সেটুকুও প্রয়োজন নেই। এদের আবার সাজ পোষাক লাগে না। প্রসঙ্গত মনে পড়ে বহুদিন আগের পড়া এক ভদ্রলোকের কথা, মুখাভিনয় করতেন। কষ্ট কল্পনাতেও দূরদর্শনের কথা কেউ তখন ভাবে না, রেডিওর রমরমা। ঐ মুখাভিনেতার সাথে আকাশবাণীর এক কর্মকর্তার খুব বন্ধুত্ব ছিলো, যাতায়াত ছিলো পরস্পরের বাড়িতে। অভিনেতা ভদ্রলোককে দেখলেই পাড়ার এক শুভানুধ্যায়ী আন্তরিকভাবে অত্যন্ত দুঃখিত সুরে বলতেন, ঐ ভদ্রলোক তোমার কেমন বন্ধু বুঝি না বাপু, তোমাকে রেডিওতে একটা চান্স করে দিতে পারে না?

পাড়ায় পাড়ায় নাটকের ক্লাব আছে। পুজো-মেলা উপলক্ষ্যে নাটক মঞ্চস্থ করা আছে। চাঁদা তোলা আছে। টিকিট বিক্রি করে, বিজ্ঞাপন জোগার করে প্রোডাকশনের খরচ তোলা আছে। এছাড়া রিহার্সাল বা মহড়া আছে। এত আছের ঠ্যালায় শেষের আছে টি প্রায় না থাকার মত। ফলে কুশীলবদের আস্ফালন, কিস্যু ভেবোনা গুরু, স্টেজে মেকাপ হয়ে যাবে। শুরু হোলো মেকাপ প্রথম দৃশ্য থেকে—কুরুক্ষেত্রে অভিমন্যু মহাভারতের গল্প নয়। অ্যাবস্ট্রাকট নাটক, মহাভারতের পটভূমিকায় একজন বেকার শিক্ষিত যুবক জীবন যুদ্ধে ঢুকে পড়লো কিন্তু জিততে পারলো না। মহাভারতের কথা অমৃত সমান—ভেবে বিন্তি পিসী এসেছিলেন গায়ে নামাবলী চড়িয়ে নগদ পয়সায় টিকিট কিনে। আন্তর্জাতিক পিসী—বাবার পিসী ছেলেরও পিসী, অনেকটা 'মনে করি আলফা একটি ধ্রুবক'-এর মত। গুটি তিনেক দৃশ্য অসহায়ের মত দেখলেন। তাঁর শোনা মহাভারতের সাথে মিলছে না। চতুর্থ কিংবা পঞ্চম দৃশ্যে ছেঁড়া লুংগী ঘামে ভেজা খাদীর পাঞ্জাবী পরা বাজারেরর থলে হাতে অর্জুনকে যখন দেখলেন ব্যাগী প্যান্ট পরা অভিমন্যুকে ইন্টারভিউয়ের কথা কাঁপা কাঁপা গলায় মনে করিয়ে দিচ্ছে তখন তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। সেই বিখ্যাত কণ্ঠে, যার কল্যানে পাকা পেঁপে খেতে গাছে কাক বসে না, চিৎকার করে উঠলেন—হারামজাদা কাঁচা খেকো সব ঠাকুর দেবতা নিয়ে এসব কি মস্করা হচ্ছে, হ্যাঁ। অর্জুনের হাত থেকে গাণ্ডীব নয় থলে খসে পড়লো, প্রম্পটারের হাত থেকে পাণ্ডুলিপি। বহুকষ্টে পিসীকে আসর থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো, ততোধিক কষ্টে ভাঙ্গা নাটক জোড়া দেওয়া শুরু হলো। নাটক শেষ হলো। জগদানন্দবাবু ভূগোলের শিক্ষক, রিটায়ার্ড এবং বিপত্নীক।'বিনাব্যয়ে চক্ষু অপারেশন'ক্যাম্পের 'আধঘন্টায় হাঁটিয়া ফিরিয়া আসিবেন' এর কৃপায় মোটা কাঁচের চশমাতে বিশেষ আর দেখেন না, তবে শোনেন ভালো—শ্রবণ যন্ত্রটি চমৎকার, মৃতা স্ত্রী বাসন্তী দেবীর নামে শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের একটি পদক দেবেন বলেছিলেন। মঞ্চে উঠে বললেন, 'যে ছেলেটি সকলের পার্ট প্রথমে বলেছিল, নারী-পুরুষ সকলের, তার গলা আমি পেছন থেকে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি, পরিষ্কার গলা সুন্দর ওঠা নামা, চমৎকার আবেগ তাকেই আমি পদক টি দিতে চাই। স্যার, ওতো প্রম্পটার, অভিনয় করেনি। সে আমি জানি নে, তবে ওর ছাড়া আর কারো গলাই শোনা যায়নি—তা আমি কি করবো।

শোনা গল্প। বাবার ছোট বেলায় যাত্রা চলছে। খুবই দুঃখের দৃশ্য। গ্রাম থেকে মা গেছেন শহরে ছেলের কাছে। বৌমার চক্রান্তে তিনি হচ্ছেন বিতাড়িতা। আঁচল লুটিয়ে চোখে জল টলটল করছে—মায়ের ভূমিকায় গোঁফ কামানো অনাদি দা, যিনি এক টানে গাঁজার কল্কে ফাটানোয় বিখ্যাত, আসর জমিয়ে দিয়েছেন। ছেলে অনেকটা 'নেতাজীর দিল্লি চলো'র মত হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। বেহালা বোবা কুকুর ঠ্যাঙানোর মত আর্তনাদ করে চলেছে এমন সময় বিবেক 'মায়ের যাতনা কে বোঝে হায়' বলে আসরে। শেষ করে চলে যাচ্ছেন, উল্টো দিক থেকে রব উঠলো 'এনকোর'। ঘুরে এসে আবার গান শুরু হলো বিবেকের। ঘুরে ঘুরে হোক। হতে লাগলো। খান পাঁচেক

বিবেকের গান থাকবেই। প্রতিটি ঘুরে ঘুরে হবেই। যাত্রা মাঝ পথ যাওয়ার আগেই সূর্যি মামা দেয় হামা, গায়ে দিয়ে লাল জামা। যাত্রায় যে নাটক এর বাইরেও আর এক নাটক আছে। সেটাও শোনা। প্রতি গানে 'এনকোর' বলার জন্যে বাচ্ছারা পেতো রতন মামা—গ্রাম সুবাদে মামা, যিনি বিবেক সাজতেন, তার কাছ থেকে দুটি করে 'নৈবু ন্যাবেনচুষ'। এখন অবশ্য সারা রাত ধরে যাত্রা হয় না তবে এক একটা যাত্রার নাম বলতে সারা রাত কেটে যায়, প্রায় গোটা গল্পটাই গুঁজে দেওয়া থাকে। এই শহরে এ বছরে শ্রেষ্ঠ সামাজিক পালা যেটি সম্প্রতি অভিনীত হয়েছে, 'বৌমা, তোমার শ্বশুর পারে না খেতে, কাঁকড় বেছে নিও চাল দেওয়ার আগে হাঁড়িতে'।

কি কুক্ষণে যে দক্ষিণেশ্বরের পাগল ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন 'থ্যাটারে লোকশিখ্যে হয়'—তারপর থেকে শেখার চেয়ে শেখানোর লোক বেশী হয়ে গেল। ম্যারাপ বাঁধা, খুঁটি পোঁতার মানুষ পাওয়া দায়। সবাই অভিনেতা। জীবনের মধ্যে নাটক খুঁজে চলেছে। মুষ্টিবদ্ধ হাত, ঘোর লাগা চোখ। ডায়লগ আওড়াতে আওড়াতে পথ চলেছে দেখে মনে হয় সদ্য বিনা চিকিৎসায় রাঁচী ফেরৎ। কিন্তু কাজের লোক পাওয়া গেল অপ্রত্যাশিত ভাবে। এমন করিতকর্মা ছেলে নীরোদের মামা শ্বশুর যে হরনাথ বাবু তা কি কেউ জানতো? হরনাথবাবুর ভাগ্নী-জামাই পুজোর সময় এসেছে কলকাতায়। গ্রামের ছেলে দিব্যি জোয়ান, সকালে এঁখো গুড় দিয়ে মুঠো ভরা ভেজা ছোলা-বাদাম সাঁটিয়ে দৌড়ানো চেহারা। সকালে বাসী মুখে বিছানায় চিৎ হয়ে দু'কাপ চা মেরে খেউ খেউ করে ঢেঁকুর তুলে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে চুল ফোলানো নায়কোচিত চেহারা নয়। কোন বিশ্রাম নেই ইতঃস্তত ভাব নেই নীরোদের কাজে বা হারে ভাবে। যা কিছু অসম্পূর্ণ কাজ ছিলো সব কিছুতেই হাত লাগালো। নীরোদের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত মূর্তি

দেখে নাটকের ডিরেকটার পদ্মলোচনবাবু অত্যন্ত চিন্তিত মুখে ঘন ঘন সিগারেট খেতে লাগলেন। অবশেষে হরনাথবাবুকে ডেকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে প্রস্তাব দিলেন, আপনার বা আপনার ভাগ্নীর যদি আপত্তি না থাকে তবে ঘাতকের চরিত্রটা নীরোদ করুক। ঘাতকের চরিত্র যে ছেলেটি করছে এ্যাকচুয়ালি তার যা শরীর স্বাস্থ্য তাতে ও মরা পাবদা মাছ কাটতে পারবে বলে সন্দেহ হয়। একটু পুলকিত হলেও হরনাথবাবু একজন আঁতেলের মত কিন্তু কিন্তু করতে শুরু করলেন—রিহার্সাল না দিয়ে কি সম্ভব হবে? আদতে পদ্মলোচন বাবুর উপর হরনাথবাবুর একটু রাগ আছে। একই হাউসিং এস্টেটে তাঁদের বসবাস এবং বছর সাতেক ধরে এখানে নাটক হচ্ছে। পদ্মলোচনবাবু তার বাঁধা ডিরেকটার। দ্বিতীয় বৎসরে উনি হরবাবুর প্রবল উৎসাহ দেখে তাঁকে একটি চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ দিয়েছিলেন এজন তোতলা মৃগী রোগীর। ওতে তাঁর ভূমিকা এতই ন্যাচারেল হয়েছিল যে সেরা অভিনেতার পুরস্কার তিনিই পান। পরের বার আলেকজাণ্ডারের ভূমিকাতে রিহার্সাল খুব আশাপ্রদ দিলেও অভিনয়ের দিন মঞ্চে তাঁর চরিত্রচিত্রায়ন দেখে ঐ অঞ্চলের সমস্ত ক্লাস সিক্সসের ছাত্রছাত্রীরা টার্মিনাল পরীক্ষায় লিখেছিলো—পুরুর বীরত্ব দর্শন করিয়া আলেকজাণ্ডার ভয়ংকর ভাবে কাঁপিতে থাকেন এবং দাঁত খিচাইতে খিচাইতে পুরুকে রাজ্য ফিরাইয়া দেন। তারপর অন্য কোন চরিত্র হরবাবুকে দেওয়া হয়নি। অনেকক্ষণ পদ্মবাবুকে খেলিয়ে শেষপর্যন্ত হরবাবু রাজী হয়ে ভাগনী জামাইকে ডাকেন এবং পদ্মবাবু পরিচালক সুলভ ভঙ্গিমায় নীরোদের আপাদমস্তক দর্শন করে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর কিঞ্চিত গাঢ়তর করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তুমি কি এখানে অভিনয় করবে, অবশ্য আমি সব বুঝিয়ে দেবো।— গ্রামে একবার করেছিলাম, বললে করতে পারি। এ নাটকে তোমার শরীরটাই আসল চরিত্র, কথা বেশী নেই। গ্রামের নাটকের মত হেঁ-হেঁ করা চলবে না। যেমনটি বলবো তেমন করা চাই।—আজ্ঞে। নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার দুদিন বাকী। পদ্মলোচনবাবুর তত্ত্বাবধানে গভীর অধ্যাবসায়ে নীরোদ ঘাতকের ভূমিকা অনুশীলন করতে লাগলো। যদিও নীরোদের প্রবেশ প্রায় শেষ অর্দ্ধে তবে বেশ হৃদয় বিদারক দৃশ্য এবং ক্লাইমেকস তোলার পক্ষে অতি মূল্যবান তার অংশ। রাজা তার একান্ত বিশ্বাসী এক সৈন্য সম্পর্কে অন্যের প্ররোচনায় ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তাকে ঘাতকের হাতে তুলে দেবেন হত্যার জন্যে। যখন তিনি ভুল বুঝতে পারবেন তখন দেরী হয়ে গেছে। দুটি অন্য দৃশ্যের পর ঘাতক ঐ সৈন্যের ছিন্নমুণ্ডু নিয়ে এসে রাজার সামনে রাখবে। হাহাকার করতে করতে রাজা ঘাতকের খড়্গ নিয়ে নিজের গলায় বসিয়ে দেবেন এবং পর্দা পড়ে যাবে। প্রথমে ঠিক ছিলো নীরোদ একটি এ্যলুমিনিয়ামের হাঁড়ী কাপড়ে ঢেকে ট্রের উপর বসিয়ে ছিন্নমুণ্ডু নিয়ে যাবে। অভিনয় প্রাণবন্ত করার জন্য নীরোদ কাগজ টাগজ দিয়ে একটা কাটামুণ্ডু তৈরী করে বৌয়ের

ব্যবহারের প্রায় সব আলতা সিঁদুর দিয়ে ঐ বীভৎস গোলাকার পদার্থটিকে পদ্মবাবুকে দিয়ে হাঁড়ীর বদলে ছিন্নমুন্ডু হিসাবে পাশ করায়। নাটক শুরু হলো রাত আটটা নাগাদ। বিকেল পাঁচটা থেকেই গোঁফ লাগিয়ে খাঁড়া কাঁধে নীরোদ প্রস্তুত। যদিও তার দৃশ্য আসতে আসতে প্রায় সাড়ে দশ কি এগারো। গ্রীণরুমে বীরদর্পে কাঁধে খাঁড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে নীরোদ, কখনো গোঁফ টেনে দেখে নিচ্ছে আবার মাঝে মাঝে উইংসের আড়ালে থেকে দর্শকের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে। প্রথম সারিতেই হরবাবুর ভাগ্নী স্ত্রী, পুত্রকে নিয়ে বসেছেন। নাটক জমে উঠেছে। বিশেষ বিশেষ জায়গায় করতালি পড়ছে। হঠাৎ উইংসের আড়াল দিয়ে উঁকি মেরে আঁতকে উঠলো নীরোদ—এই রে বৌতো ঘুমে ঢুলে পড়ছে মামীর কাঁধে। ইতিমধ্যে মঞ্চে ঐ মারাত্মক দৃশ্যের শুরু। রাজাকে প্ররোচিত করা শুরু হয়েছে। নীরোদের বৌয়ের বুঝি আর দেখা হয় না। প্রিয় একান্ত বিশ্বাসী সৈন্য রাজার সামনে নতজানু হয়ে; রাজা চিৎকার করে উঠলেন—ঘাতক, এই অবিশ্বাসীকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে বলি দিয়ে পাপিষ্ঠর ছিন্নমুণ্ডু আমাকে দেখাও। টেনশানে নীরোদের কপালের দুপাশে টিপটিপ যন্ত্রনা করছে আর অভিনয়, অবিস্মরণীয় হস্তশিল্প এই ছিন্নমুণ্ডু, বৌকে দেখানোর শেষ সুযোগ। বৌ যদি নাই দেখলো তাহলে অন্য দর্শকরা দেখুক বা নাই দেখুক নীরোদের তাতে কিই বা যায় আসে? ধৈর্য্য রাখতে না পেরে বাঁ বগলে ছিন্নমুণ্ডু ডান কাঁধে খাঁড়া নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করলো নীরোদ। যে সৈন্যের ছিন্নমুণ্ডু আনার জন্যে ঘাতককে রাজা আহ্বান করেছেন সে মুণ্ডসহ নতজানু হয়ে আছে। কথা ছিলো, এইবার ঘাতক ওকে টেনে নিয়ে চলে আসবে। রিস্ক নিলো না নীরোদ, হুংকার দিয়ে উঠলো মহারাজ। এই সেই পাপিষ্ঠর ছিন্নমুণ্ডু—বলে রাজার পদতলে অনবদ্য শিল্পটি নামিয়ে রাখলো। দর্শকরা দেখলেন, হরবাবু পদ্মবাবু নীরোদের বৌ দেখলো, এমন কি যে সৈন্যকে বলি দেওয়ার কথা সে পর্যন্ত জুলজুল করে নিজের ছিন্নমুণ্ডু দেখতে লাগলো।

— কিছু মনে করোনা ভাই, সামনে বাপনের পরীক্ষা। এখন আমার এক মুহূর্ত গল্প করার সময় নে—ই!

ছড়রর....রা

নরকেই যেতে চাই

সুবীর গুপ্ত

আমরা বাঙালী মাছের কাঙালী
সন্দেহ নেই তায়
সেখানেই পাই মাছের গন্ধ
সেখানেই প্রাণ ধায়।

রজনীগন্ধা, স্বর্ণচাঁপায়
আমাদের কাজ নাই
এ' বেলা, ও' বেলা প্রত্যহ যেন
কাতলার মুড়ো পাই।

স্বপ্নের মাছ গলদা চিংড়ী
ভাগ্যেতে যদি জোটে
দুই শত টাকা প্রতি কিলো মাছ
কিনি ডঙ্কার চোটে।

ভালবাসি মোরা সুগন্ধী ভাত
পারশে ভাজার সাথে
বিধাতার কাছে করি না নালিশ
ইলিশ পড়িলে পাতে।

অতি সুস্বাদু পুঁটি ভাজা আর
কাদা চিংড়ীর বড়া।
গন্ধে তাহার চোখ মেলে চায়
বাঙালীর বাসি মড়া।

নাই যদি পাই মাছের বাজার
সে স্বর্গে কাজ নাই
পাই যদি মাছ নরকে বন্ধু
নরকেই যেতে চাই।

॥ শিল্প-ধর্মঘট ॥

বিনম্র বিশ্বাস

শিল্প নিয়ে ধর্মঘটের
যা-ই থাকুক মানে,
ধর্মঘটও শিল্প এখন
সবাই এটা জানে।
সেই শিল্পেরই কারখানাতে
নিষ্প্রয়োজন শ্রম,
'আরাম'-ই এর রিয়েল প্রডাক্ট
নেইকো তাতে ভ্রম!
সেই আরামই লুটতে গিয়ে
খেলায় মাতি পথে,
কিংবা বসি তাস পেটাতে
সারাদিনের মতে।
খেলতে খেলতে পেটের টানে
যখন বাড়ি আসি
চমকে উঠি দেখে বৌয়ের
মুখের বাঁকা হাসি।
বাঁকা হাসি বাড়ায় আরো
দারুণ ক্ষুধার জ্বালা,
দেখছি একি! রান্নাঘরে
ঝুলছে বিরাট তালা!
গিন্নী শেষে বলল যা ভাই
নয়কো সেটা গল্প,
বলল—মশাই, জেনে রাখুন—
রান্নাটাও এক শিল্প!

———

মহা ভারতের কথা

অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়

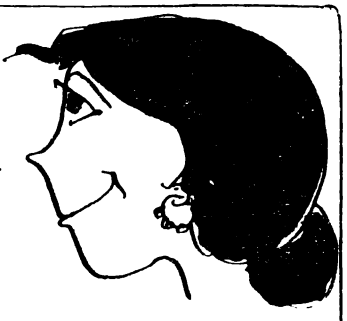

গুরু কহিলেন, "বৎস, সাধুসহবাস
ত্রিতাপ হরণ করে, মোহ করে নাশ।
অতএব সাধুসঙ্গ কর সযতনে।"
এত শুনি বাহিরিনু ভারত ভ্রমণে।

কুমারিকা-কনখল আসমুদ্র হিমাচল
পায়দলে করিনু ভ্রমণ।
যতেক আশ্রমে মঠে দূরে কিংবা সন্নিকটে
সর্বঘটে কৈনু অন্বেষণ।
কতো না সাজের ঘটা, কারো দাড়ি, কারো জটা,
কারো শিরে শিখা শোভে ক্ষীণ,
কারো গায়ে নামাবলী, কারো গা বেবাক খালি
পরিধানে সামান্য কৌপীন।
ঊর্ধপদ হেটমুণ্ড চৌদিকেতে অগ্নিকুণ্ড
আকণ্ঠ নিমগ্ন কারো জলে,
কেহ উগ্র সাম্যবাদী, কারো অঙ্গে মোটা খাদি,
নির্বিচারে সেবিনু সকলে।
কেহ করে 'হরি ওম্', কেহ করে 'বোম্ বোম্'
কেহ হাঁকে 'বন্দে মাতরম্',
কেহ ছাড়ে সিংহনাদ 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'
কারো থেকে কেহ নহে কম।
সাথে নিজ ভার্যা লয়ে থাকে পাটি কার্যালয়ে
দাদাদের শুনিলাম বাণী
কথা খুব লম্বা লম্বা কাজে সব অষ্টরম্ভা
ততোধিক দিদিঠাকুরাণী।

সবার সমান খাঁই এটা চাই, ওটা চাই,
কেহ চায় চাঁদা, কেহ ভোট,
যদি শোনে সাংবাদিক তাহলে বলিবে ঠিক
"ভাল ক'রে লিখিও রিপোর্ট।
আমিই আসল নেতা ধোওয়া তুলসীর পাতা
ওরা সব নীতিভ্রষ্ট চোর।"
শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী কারে রাখি, কারে ফেলি
সেইরূপ দশা হৈল মোর।
বাঁশ বনে ডোম কানা কিছুতে গেল না জানা
কেবা সাধু, কেবা প্রবঞ্চক,
খাঁটি-মেকি চেনা দায় মিশে আছে দুজনায়
সরিষায় শৃগাল কণ্টক।
রামা শ্যামা সাধারণে গণনায় নাহি গণে
দরশন দেয় বেছে বেছে,
সাধুসঙ্গ আশা ছাড়ি মনে হোল ফিরি বাড়ী
ধ্যুত্তোর! নিকুচি করেছে!
হতাশ হৈয়া শেষে ফিরে এনু নিজ দেশে
ভারত ভ্রমণ করি শেষ,
বুঝিলাম কী ব্যাথায় বলেছে ডি· এল· রায়
"সেলুকস, বিচিত্র এ দেশ!"

মহা ভারতের কথা অমৃত সমান
পাগলে কত কি বলে দিও না কো কান।
অনুমতি কর এবে পালা সাঙ্গ করি,
হাতে তালি দাও, মুখে বল, 'হরি হরি'।

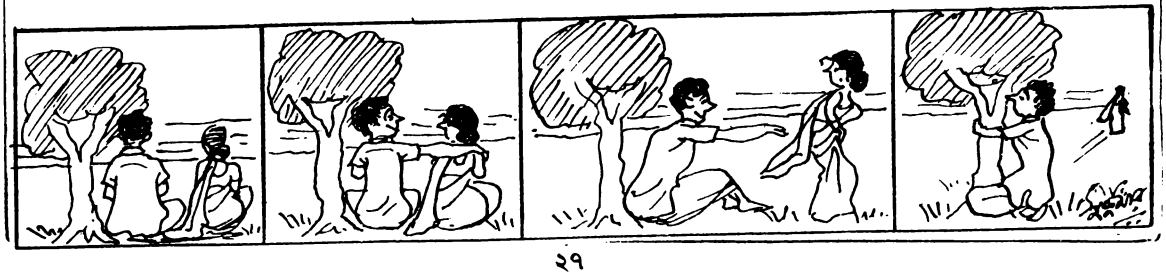

বিয়ে ঘটিত ঘটনা

মণীশ মাইতি

আমি স্থির করেছিলাম প্রেম করবোনা। টোপরও পরবো না। যা সব দেখছি, শুনছি, বুঝছি তাতে আমার পিলে চমকে গেছে। বিয়ের মোহ ভেঙ্গে গেছে। জীবন সঙ্গিনী এসে যদি হয় রণরঙ্গনী তাহলে তো জীবনে বহু ভোগান্তি। হয়ত আজীবন জীবন নিয়ে চলবে টানাটানি। তাই ও রাস্তা থেকে দূরেই সরে রইলাম। তাতে যাক প্রাণ থাক মান। আমি একা আছি একা থাকব। দোকা হব না। খাব-ঘুমাবো-আড্ডা দেবো। বম্বে-দিল্লী-দার্জিলিং-কাশ্মীর যাব। বই পড়ে, গান শুনে, সিনেমা দেখে লাইফটা কাটিয়ে দেব। কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না। কেউ কিছু বলতেও পারবে না। বাড়ি-ঘরের চিন্তা থাকবে না। বেবিফুডের জন্য লাইন দিতে হবে না। শাড়ি -ব্লাউজ নিয়ে রাগারাগি, মান-অভিমান থাকবে না। আমি লুঙ্গি পরি আর গামছা পরি কারো চোখে ঠুলি পড়বে না। দিব্যি বাউণ্ডুলে হয়ে একদিন পরম গতি লাভ করবো। সোজা যমের দুয়ারে যাব। পিছন ফিরে ভাবতে হবে না। আরে বাবা; মরতেই হবে—"জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে"। তাই যদ্দিন বাঁচি ঝাড়া হাত-পা হয়েই বাঁচবো। আমার বন্ধুরা কেউ কেউ প্রেমিকা নিয়ে ফুর্তি-টুর্তি করে। পরে বিয়ে থা করবে। আবার অনেক বন্ধু বিয়ে-থা করে সুখে দাম্পত্য জীবন-যাপন করছে। ওদের পুত্র কন্যা হবে। নাতি-নাতনি হবে। সাজানো-গোছানো ঘর-সংসার। আমার ওসব বালাই নেই। থাকবেও না। আরে বাবা; কেউ কি দিব্যি দিয়েছে নাকি যে সবাইকে এমন হতে হবে? যার খুশি সে করেছে। আমার ইচ্ছে নেই আমি করব না।

আমি বিয়ে না করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। কারো কিছু এসে যাবে না। অতএব আমি বিয়ের কথা গায়ে মাখি না। ও নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমি মাথা না ঘামালে কি হবে। গুষ্টি শুদ্ধ লোকের মাথা ব্যথার কারণ ঘটল। এবার তাদের সেই কথাই বলি। আমায় নিয়ে সবাই যেন মহা সমস্যায় পড়ল। বন্ধুরাও উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। কাল বিলম্ব না করে এক বন্ধু ছুটে এল সকাল-সকাল। বলল—কি রে, শুনলাম; তুই নাকি বিয়ে করবি না। তুই নপুংশক না ভীষ্ম যে বিয়ে করবি না।

আবার কোন কোন বন্ধু কত জ্ঞান, কত উপদেশ দিল আমি কারো কথায় কান দিলাম না। কিন্তু আমার ধনুকভাঙ্গা পনের কথা কানাকানি হয়ে বহুদূর ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের পাড়ায় ডলিদের বাড়ি। কি একটা কারণে ওদের বাড়ি যেতেই ডলির মা টিপ্পনি কেটে বললেন—কি গো বাবা সন্ন্যাসী ? বনে বাদাড়ে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ? এভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়ালে তোমায় সাপে কাটবে না ব্যাঙে কাটবে কে জানে? না জানি শেষে কোন সন্ন্যাসীনীর পিছু পিছু ঘুরবে। তখন যদি তোমার মাথায় ঘোল ঢেলে নেড়া মুণ্ডি করে ছাড়ে।

আমি উত্তর না দিয়ে মসিমার কথা শুনে পিটপিট করে হাসতে থাকলাম। সামনে ছিল ডলি। ধিঙ্গি মেয়ে! ভারি ফাজিল। ঠিক ওর মায়ের মতনই। সে এবার ফোড়ন কাটতে লাগল।

—আচ্ছা অনিদা, (আমার ডাক নাম) তোমার বুঝি বিয়ে করতে ইচ্ছে করে না?

—না।

—তোমায় সারা জীবন রেঁধে-বেড়ে যাওয়াবে কে?

—কেন, হোটেলে খাব। দরকার হলে নিজে রান্না করব।

—আচ্ছা, তা নয় হল। কিন্তু সারা জীবন কাটাবে কি করে? অন্য কোন কিছু ব্যবস্থা আছে বুঝি?

আমি চোখ মুখ পাকিয়ে বললাম, তোকে অত ভাবতে হবে না। বড্ড ডেঁপো হয়েছিস, যা ভা-গ, পালা এখান থেকে।

—বা-রে, অত রেগে যাচ্ছ কেন? তোমার কি খিদে-তৃষ্ণা কিছু নেই নাকি? বলে খিল-খিল করে হাসতে লাগল।

না। ওদের সঙ্গে পারা যাবে না। তার চেয়ে সস্থানে প্রস্থান করাই ভাল মনে করে ওদের বাড়ি থেকে পালিয়ে আসি।

এরপর দেখা হল এক মাঝ-বয়সী ভদ্রমহিলার সঙ্গে। সম্পর্কে তিনি হলেন আরেক পাড়াতুতো মাসিমা। ওনার এক ফুলটুসি মেয়েকে আমার হাতে গছানোর বাসনা বরাবরই। সেজন্য আমাকে বেশ একটু ইয়ে-টিয়ে করত। হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি তড়িঘড়ি আমায় তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। বাবা-বাছাধন বলে আদর যত্নের বন্যা বইয়ে দিতে লাগলেন। তাঁর ঐ ফুলটুসি মার্কা মেয়েটি আমায় দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠল। খুশিতে গলা ছেড়ে গান শোনালো। নাচও শিখেছিল। অন্যকে নাচাতেও জানত। আমার ভাগ্যটা বোধহয় ভাল নয় নচেৎ এমন একটি মেয়ে পেয়েও আমার 'পণ' পরিবর্তন হয়ে প্রেম-পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হল না। এরপর আমি বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। দিনরাত ঘরে থেকে বইপত্র পড়ে সময় কাটাতে লাগলাম। কিন্তু ঘরে থেকেও নিস্তার নেই। সেদিন শুনতে পেলাম, আমার পিতা, মাতাকে জানাচ্ছেন—'তোমার ছেলের ভীমরতি ধরেছে বিয়ে করবে না—ব্রাহ্মচর্য পালন করবে।

আমি গৃহত্যাগী হব ভেবে মা ভাবনা-চিন্তায় বিচলিত হয়ে বললেন—হ্যাঁ, রে অনি, তুই বিয়ে করবি না? আমি নাতি-নাতনির মুখ দেখতে পাব না? শুধু এই সংসারের বোঝা বয়ে বেড়াবো। বুড়ো বয়সে কি একটু বিশ্রাম পাব না। ইত্যাদি বলতে বলতে মায়ের চোখে জল এসে গেল। মা শুধু আমাকে বলেই ক্ষান্ত হলেন না। কাকা, জেঠাকে বলতে লাগলেন—দেখো না গো তোমরা। অনি যে আর ঘরে থাকবে না। ও না কি সন্ন্যাসী হবে!

আমার দিদিমা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এলেন, তিনি মায়ের মুখে আমার কথা শুনে যথারীতি মন্তব্য করলেন—আমাকে বোধহয় কোন মেয়ে তুক্‌তাক্ করেছে। সে জন্যেই আমি বিয়ে করতে চাইছি না। আমায় নিয়ে সবাই এত অস্থির হয়ে উঠল যে আমার পক্ষে সুস্থিরভাবে থাকাই দায় হল।মনে মনে ঠিক করলুম যে যা ভাবে ভাবুক। বলে বলুক। তাতে আমার ভারি বয়েই গেল। আমার গায়ে তো আর ফোসকা পড়ছে না। এক কান দিয়ে ঢুকলে আরেক কান দিয়ে বের করে দেব। ল্যাঠা চুকে যাবে। কিন্তু নিস্তার পাওয়া অত সহজ নয়। পাওয়াও গেল না। আমার ছোট বোন মিনু, বি.এ পড়ে। সে এবার আসরে নামল। আমাদের ভাই বোনের সম্পর্কটা বেশ মধুর। একটুতেই ঝগড়াঝাটি-ছাড়াছাড়ি। পরক্ষণেই মধুর মিলন। যাই হোক বোনের সঙ্গে শুরু হল তর্কাতর্কি।

মিনু—তুই বিয়ে না করিস না করবি। কিন্তু তোকে যদি কেউ বিয়ে করে তাতে তোর আপত্তি কিসের?

—ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছিস? ভেবেছিস তোর চালাকি আমি কিছু বুঝি না?

—এতে চালাকির কি দেখলি? বিয়ে না করাটাই বরং এক ধরনের চালাকি। নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। পরকেও ফাঁকি দেওয়া। সে তো অকর্মের ঢেঁকিরা করে।

—যা। অত জ্ঞান দিতে হবে না। নিজের চরকায় তেল দে।

—যার চরকায় তেল দেওয়ার অভ্যাস। সে চরকা পেলেই তেল দেয়।

—যাবি না, ইয়ার্কি-ফাজলামি করবি?

—যাচ্ছি। কিন্তু তোরও ব্যবস্থা করছি।

মিনু সটকে পড়ল। কিন্তু আমি নির্ভয় হতে পারলাম না। মিনু যা মেয়ে। একটা কিছু না করে ছাড়বে না। পেটে পেটে ওর শয়তানি বুদ্ধি। কে জানে, কি মতলব আঁটছে। যা ইচ্ছে হয় করুক গে। করতে দাও। আমাকে যে টলানো অত সহজ নয়, সেটাই এবার হাড়ে হাড়ে টের পাবে। এই ভেবে আমি নিজের কাজে মন দিলাম।

পরের দিন মিনু রীতা নামে তার এক সুন্দরী বান্ধবী কে নিয়ে এল আমাদের বাড়িতে। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। আমাদের দুজনকে নিভৃতে গল্প করার সুযোগ দিয়ে ও অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে চা-টা নিয়ে আবার তার আর্বিভাব হল। ঘন্টা খানেক গল্প-গুজব করার পর রীতা বিদায় নিল। তারপরের দিন মিতা নামে আরেক সুন্দরী বান্ধবীকে নিয়ে এল মিনু। সেদিনও ঐরকমভাবে আমার সঙ্গে গল্প-গুজব করার সুযোগ করে দিল তাকে। তারপরের দিনও আরেক বান্ধবী কে নিয়ে এল। এইরকম ঘটনা ঘটতে লাগল কয়েকদিন। বোনের মতলব বুঝতে আমার আর বাকী রইল না। ও ভেবেছিল সুন্দরী মেয়েদের দেখে, তাদের সঙ্গে গল্প-গুজব করে আমি গলে যাব। আর রীতা, মিতা নয়ত সতীকে গলায় ঝুলিয়ে নেব।

এবার ঠিক করলাম আর বাড়িতে থাকা চলবে না। অন্যত্র চলে যাওয়াই ভাল। কথায় বলে "সাবধানের মার নেই"। একটা বাড়ী ভাড়া নিতে হল। উঠে গেলাম সেই বাড়িতে। যাকে বলে নিরাপদ আশ্রয়। নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজে লিপ্ত হলাম। ভেবেছিলাম কোন ব্যাটা-বেটি আমায় আর ফাঁদে ফেলাতে পারবে না। কিন্তু এই ত্রিভূনে সর্বত্রই যে প্রেমের ফাঁদ পাতা আমার জানা ছিল না। ছলে-বলে-কৌশলে একদিন নিজেই ফাঁদে পা দিলাম। এবার সেই কথাই বলি।

একদিন দেখি, আমাদের অফিসে একটি নতুন মেয়ে এল।

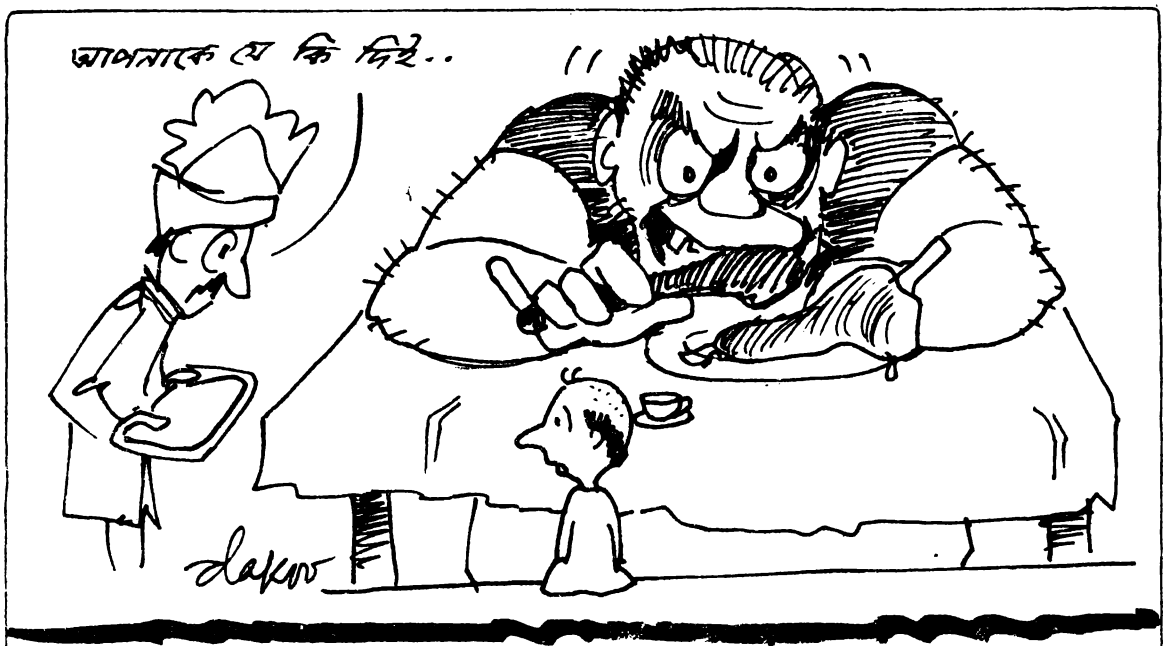

সেই দিনই সে জয়েন করেছে। টাইপিস্ট। আহা! সুন্দরী বটে। ছিপছিপে লম্বা, ফর্সা, মুখটা শ্রীদেবীর মতন। পরণে নীল শাড়ি, নীল ব্লাউজ কপালে নীল টিপ। আমার পাশে ওর বসবার জায়গা করা হয়েছে। মেয়েটা চোরা চাউনিতে বারবার তাকাচ্ছিল আমার সঙ্গে চোখাচোখি হচ্ছিল। মিষ্টি সুলভ হাসিতে ও চোখ নামিয়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ দেখি মেয়েটি আমায় চোখ মারল। আমি তো অবাক। জানা নেই, শোনা নেই একটা মেয়ে কিনা চোখ মারে! কি বজ্জাত মেয়েরে বাবা! এই ঘরে আরও তিনজন স্টাফ কাজ করে। দেখলাম তারা কেউ দেখছে কিনা। না কেউ দেখেনি। দেখলে তো প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যেত। না বাবা এমন মেয়ের দিকে না তাকানোই ভাল। এই মনে করে মাথা গুঁজে নিজের কাজে মন দিলাম। ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে উঠে দাঁড়ালাম। দেখি, মেয়েটিও তখন চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এমন সময় নজর পড়ল টেবিলের তলায় একটি লেডিস রুমাল। রুমালটি কুড়িয়ে নিয়ে মেয়েটিকে দেখিয়ে বললাম—ম্যাডাম এটা বোধহয় আপনার।

তৎক্ষণাৎ মেয়েটি চিলের মত ছোঁ মেরে রুমালটি নিয়ে গট্‌গট্‌ করে হাঁটা দিল।

তারপরের দিন মেয়েটি অফিসে এল লালের উপর টিপ-টিপ শাড়ি আর লাল ব্লাউজ গায়ে। আমি মেয়েটির দিকে না তাকিয়ে নিজের টেবিলে বসলাম। নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত হলাম। উঠলাম সেই পাঁচটায়। বেরিয়ে পড়লাম। তিনতলার সিড়িভেঙ্গে নীচে নামতে থাকলাম। মেয়েটি দ্রুত পায়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। অফিসের চৌকাঠ পেরিয়ে পিছন ফিরে দেখল। চোখা-চোখি হতেই চট করে একটা চোখ মেরে হন্‌হন্‌ করে হাঁটতে লাগল।

আমার পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেল। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগল। এতদূর স্পর্ধা, দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। এই ভেবে মেয়েটির পিছু ধাওয়া করলাম। খানিকটা গিয়ে একটা মোড়ের মাথার বাঁক ঘুরতেই ওকে আর দেখতে পেলাম না। চারিদিকে প্রখর দৃষ্টি চালালাম। কোথাও দেখতে না পেয়ে বোকার মত ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে রইলাম।

—ঠিক আছে, কাল অফিসে আসুক দেখব বাছাধনের কত দৌড়। এই ভেবে বাসায় ফিরলাম।

বাসায় ঢুকেছি এমন সময় মিনু এসে হাজির।

—কি রে, কি ব্যাপার? তুই এ সময়?

—কেন আসতে নেই নাকি?

—তা কেন। তুই এখানে এই প্রথম এলি। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম কোন দরকারে এলি কি না?

—রাস্তায় তোকে একটা মেয়ের পিছনে ছুটতে দেখলাম। ভাবলাম বুঝি তোর বউ পালিয়ে যাচ্ছে, তুই তাকে ধরতে যাচ্ছিস। তাই জানতে এলাম ব্যাপারটা কি? বলে চোখ পিট্‌পিট্‌ করে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। বুঝতে পারলাম একটু আগেই যে ঘটনাটা ঘটেছে মিনু হয়ত দেখেছে। তাই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম—তুই আজ যাবি না থাকবি?

—যাব কি রে। আজ এখানেই থাকব। মা কে বলে এসেছি।

—ঠিক আছে। তুই ততক্ষণ চা-টা কর আমি বাজার থেকে কিছু নিয়ে আসি। মাংস খাবি?

উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে চটপট বাজারে বেরিয়ে পড়লাম।

বাজার থেকে ফিরে এসে ঘরে ঢুকতেই ভূত দেখার মত

কর্তব্যরত
পুলিশ
কার্টুন
Subhajit
! ! ? !
থানা

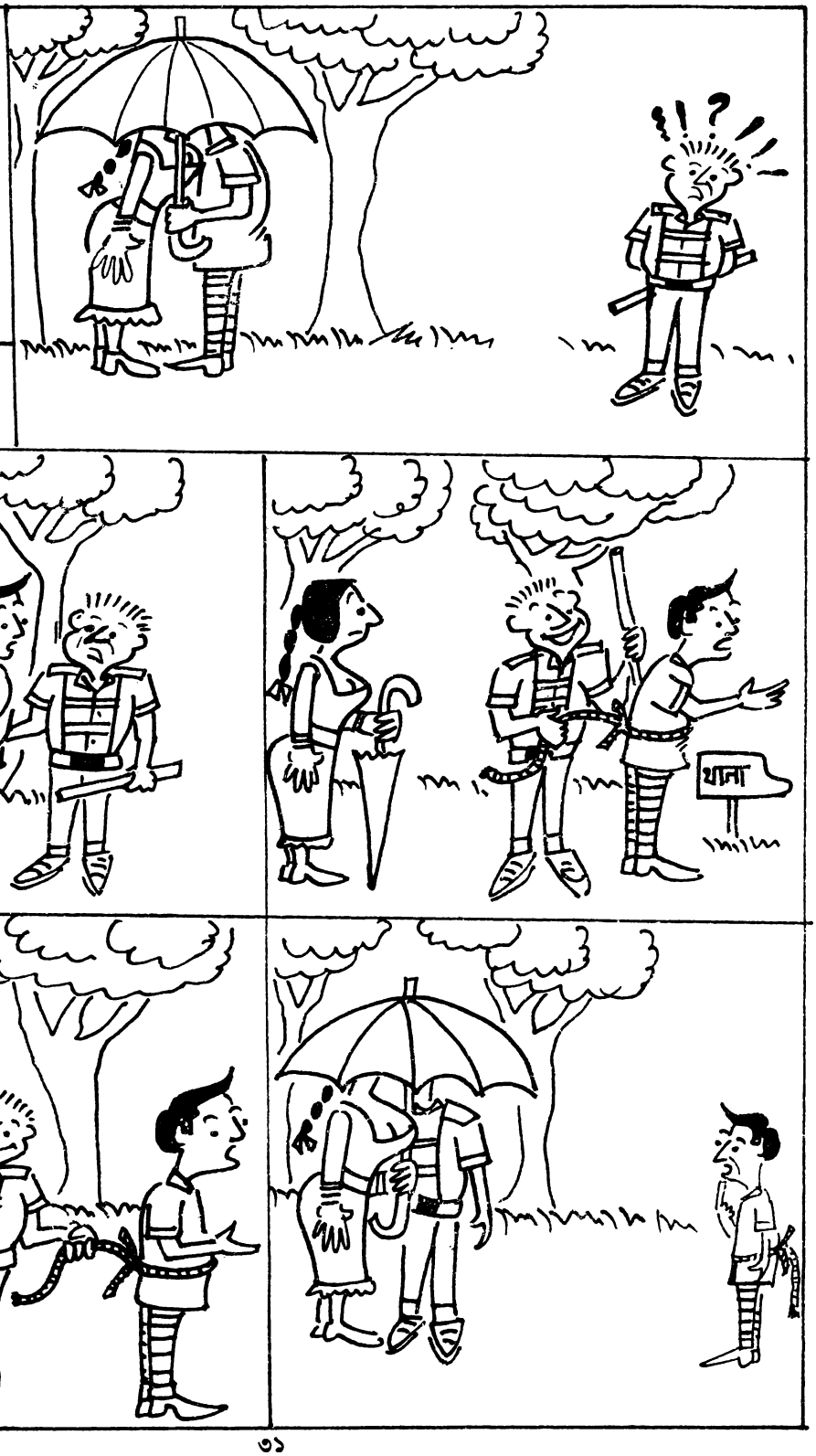

চমকে উঠলাম। দেখলাম, ঘরের ভিতর বসে আছে সেই অফিসের মেয়েটি। মাথায় খুন্ চেপে গেল। ঝাঁঝালো গলায় জিজ্ঞেস করলাম—আপনি? এখানে?

মেয়েটি—হ্যাঁ, আমি। আপনার অসুবিধে আছে? অসম্ভব গম্ভীর গলায় উত্তর দিল।

—কি দরকার? কেন এসেছেন?

মেয়েটি—বেশ করেছি।

—কি গেরো রে বাবা। বাপের নাম খগেন করে দেবে দেখছি। আচ্ছা ঝামেলায় পড়লাম তো এখন কি করা যায়। মিনু, মিনু মিনুকে ডাকতে লাগলাম।

মেয়েটি—মিনুকে ডাকছেন কেন? সে এসে কি করবে?

আমি রাগের চোটে এক ঝঙ্কার দিলাম—আপনি থামুন তো। আপনি মেয়ে নইলে·····

মেয়েটি কোমরে কাপড় জড়িয়ে রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরে বলল—কি বললেন? আর একবার বলুন? নইলে—নইলে কি—কি?

আমি তো ভয়ে খানিকটা পিছিয়ে এলাম। কি ডেন্‌জারাস মেয়েরে বাবা! যদি থানা-পুলিশ করে। লোক ডাকব? উল্টে হয়ত আমায় ফাঁসিয়ে দেবে। এখন কি করি! এইসব চিন্তায় মাথাটা কেমন বন্‌বন্ করে ঘুরতে লাগল। দু'হাত দিয়ে মাথাটা চেপে বসে পড়লাম। একটু বাদে মেয়েটি একটি থালায় লুচি, আলু ভাজা, বেগুন ভাজা আর দুটো সন্দেশ নিয়ে এসে আমার সামনে রেখে বলল—নিন, এগুলো খেয়ে নিন। এমনভাবে বলল যেন আমার কত আপনজন। আমি খাবারের দিকে চোখ তুলেও তাকালাম না। মুখেও কিছু বললাম না। পূর্ববৎ বসে রইলাম।

মেয়েটি আবার আদুরে গলায় বলল—খেয়ে নিন। না খেলে চলে যাব কিন্তু।

তখনও আমার রাগ কমেনি। মেজাজে বললাম—হ্যাঁ, তাই যান। গেলে আমি শান্তি পাই।

—আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন? কণ্ঠস্বরটা কেমন ভেজা-ভেজা লাগল। মুখ তুলে মেয়েটির দিকে তাকালাম। ওর দু'গাল বেয়ে চোখের জল টপ্‌টপ্ করে পড়ছে। যে মেয়েটিকে একটু আগে দেখেছিলাম, এ যেন সে মেয়ে নয়। মেয়েটি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল—আমার দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা করবেন। আমি এখুনি চলে যাচ্ছি। বলে, সত্যি সত্যি চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালো।

তৎক্ষণাৎ আমি ভীষণ অনুতপ্ত হলাম। মুহূর্তে একরাশ মায়া-মমতা-ভদ্রতা আমাকে ঘিরে ধরল, ডাকলাম—শুনুন।

মেয়েটি তখনও ঘরের চৌকাঠ পেরয়নি। ডাক শুনে ফিরে এল। নত মুখে সামনে এসে দাঁড়ালো, বলল—বলুন।

—আমাকে না খাইয়ে চলে যাচ্ছেন যে! নিজেও তো কিচ্ছু খেলেন না?

—আগে বলুন, আপনি আমায় ক্ষমা করেছেন কিনা? বলে মেয়েটি সেইভাবে অবনত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—ক্ষমা করতে পারি একটা শর্তে।

—কি শর্তে?

—যদি এইভাবে চিরকাল আমার পাশে থাকেন।

মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। খুশীতে লম্ফ দিয়ে বলল—সত্যি বলছেন? "প্রমিস" বলে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল।

মেয়েটির হাতে হাত রেখে বললাম—প্রমিস। সঙ্গে সঙ্গে অমনি অনুভব করলাম মেয়েদের হাত যে এত নরম হয় আগে জানা ছিল না।

ঠিক এই সময় হাততালি দিতে দিতে মিনুর উদয় হল। বলল—কি রে দাদা তুই কবে থেকে ডুব ডুবে জল খাচ্ছিস?

যেন চোর ধরা পড়ে গেছি এইরকম ভাবে থতমত খেয়ে আমতা আমতা করে বলি—তুই —তুই কোথায় ছিলি?

—বারে, আমি আবার থাকব কোথায়? এখানেই তো বসে বসে নাটক দেখছিলাম। বাব্বাঃ যা রোমান্টিক সিন্! এরপর মেয়েটির নাম ধরে মিনু তাকে বলল—সত্যি কবিতা, তোর তুলনা হয় না। তুই একটা জিনিয়াস্!

আমি ভুরু কুঁচকে মিনুকে জিজ্ঞেস করি—তুই একে চিনতিস?

—বারে চিনব না কেন? ও তো আমারই বান্ধবী।

—ও তাহলে তোরই শয়তানি বুদ্ধি?

মিনু হাসতে হাসতে আমার কথার উত্তর না দিয়ে কবিতাকে বলল—এসো বৌদি আজ তুমিই মাংসটা রান্না করবে। রাতে দাদা তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। এই বলে মাংসর ব্যাগটা নিয়ে দুজনেই রান্নাঘরের দিকে রওনা হ'ল।

জীবাণুহীন ঘরদোরের আদি-রহস্য

আসলে, এ রহস্য সকলেরই জানা। কারণ প্রতিটি পরিচ্ছন্নতা-সচেতন গৃহিনীর প্রথম পছন্দ বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর ফিনিয়ল। এই জীবাণুনাশক তরলশক্তি একই সঙ্গে নানা কাজে সক্রিয়। জীবাণু বিনাশে, মাছি তাড়িয়ে ও বীজাণু নিধন করে ঘরদোর এমনই পরিস্কার করে যা ছোট্ট শিশুদের পক্ষেও নিরাপদ।

বলাই বাহুল্য,পয়সা বাঁচাতেও ঘন কালো ফিনিয়ল-এর জুড়ি নেই। এটি এমনই ঘনীভূত, একে জল মিশিয়ে ৫০ গুণ বাড়ালেও, আসল শক্তির কোন তারতম্য হয় না। তাই এক বোতল ফিনিয়ল থেকে সমান কার্যকরী ৫০ বোতল পরিচ্ছন্ন ঘরের আদি-রহস্য তৈরী করা যায় অতি সহজেই।

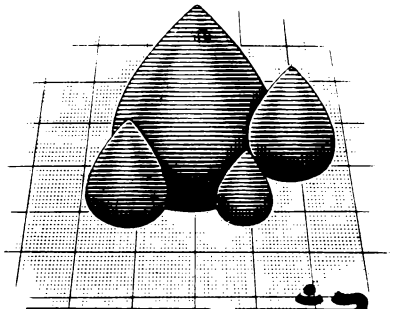

কয়েক ফোঁটা

বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর

ল্যাম্প ব্র্যাণ্ড

ফিনিয়ল

দেশের একচ্ছত্র নেতা

বেঙ্গল কেমিক্যালস এ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ

(ভারত সরকারের উদ্যোগ)

বি আই এস অনুমোদিত ফিনিয়ল

SARAS CARTOON : MARCH 1993 : PRICE : Rs. 5.00
REG. NO. RN 48276/90 : POSTAL REG. NO.WB/SC-304

কার্টুন

প্রকাশনীর উপহার

কার্টুনের বিবর্তন ও দুই বাংলার কার্টুন	৩০ টাকা
জোকার্টুন (কার্টুন ও জোকসের কালেকশন)	১৭
কার্টুন. কার্টুন. কার্টুন (কার্টুনের কালেকশন)	১৮ ,,
হাসিটুন (শুধু জোকসের কালেকশন)	১২ ,,
ছড়াটুন (মজাদার ছড়ার কালেকশন)	১২ ,,
কার্টুন কমিক	৫ ,,
আসুন কার্টুন আঁকি (কার্টুন শেখার বই)	২০ ,,
গিনিপিগ (হাসির গল্পের বই) ...	১৫ ,,
সরস কার্টুন পূজা সংখ্যা ১৯৯২	৩০ ,,
সরস কার্টুন সেট (পূজা + ১০টি সাধারণ সংখ্যা)	৪৫ ,,
—ঐ— খিচুড়ি সেট (১০টি সাধারন সংখ্যা)	২৫ ,,
আসুন কার্টুন আঁকি (দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)	২৫ ,,

(ভি.পি তে বই নিতে হলে ১০ টাকা ভি.পি চার্জ অগ্রিম পাঠাবেন)

কার্টুন প্রকাশনী
৬৯-জি সেলিমপুর রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৩১ ফোন: ৪২-৫৭৪৪

একমাত্র স্বত্বাধিকারী সুকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক কেমব্রিজ লেসার প্রিন্ট, এফ-৫৫ দক্ষিণাপন, ২ গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলিকাতা-৭০০ ০৬৮ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৬৯-জি, সেলিমপুর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৩১ হইতে প্রকাশিত। ফোন ৪২-৫৭৪৪। সম্পাদক: সুকুমার রায় চৌধুরী